নদীর সঙ্গে দেখা
অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

সকালে ঘুম থেকে উঠেই মেজাজটা খারাপ হয়ে গেল কাঞ্চনের। মা খুক খুক করে কাশছে। কাশলেই তার আতঙ্ক। কখন না আবার মা-র শ্বাসকষ্ট শুরু হয়। তাড়াতাড়ি জামাটা গলিয়ে বারান্দায় বের হয়ে এল।

মাসির চোপা শুরু হয়ে গেছে। সকাল বেলায় চোপা কার ভাল লাগে! মেজাজ খাট্টা। ঠিক ওষুধ খেতে ভুলে গেছে মা। অথবা রাত জেগে ডিউটি সেরে ফিরেই শুয়ে পড়েছে। বুক ভারী ভারী লাগলে পিল খেতে হয়। টানটা আর উঠতে পারে না। মাসি চা-এর জল চাপিয়ে বারান্দায় আগেই বের হয়েছিল বলে রক্ষা।

এত করে বলি, কথা কে শোনে! আমি কে? এত করে বললাম, ওষুধ খেয়েছ, বললে খেয়েছে। খায়নি, বুঝলি খোকা। তোর মা আমার সঙ্গে আজকাল এত মিছে কথা বলে! খাওনি—বেশ করেছ, এখন কষ্টটা কে পাবে। আমি না খোকা। নাও ওঠো।

মাসি, মাকে গরম জল আর পিল হাতে দিয়ে বলল, দ্যাখ তো খোকা উনুনের জল গরম হল কি না। চা-টা করে ফ্যাল।

আমাকেও চা দাও। কিছু হয়নি। চা খেলেই কাশি কমে যাবে।

কিছু হয়নি তো কাশছিলে কেন?

কাশি উঠলে কী করব। খোকাকে পাঠাচ্ছ, ওর দু-দিন বাদে পরীক্ষা। তুই যা খোকা। আমি দেখছি।

কাঠ কয়লার ধোঁয়া সহ্য হয় না মার। মাসির হাতে মেলা কাজ। বাবা মারা যাবার পর, মা একদম আর কাজকম্ম করতে পারে না। মার কষ্ট হয়, এমনকি সে দেখেছে, ফুঁপিয়ে কাঁদলেও কাশি উঠে যায়। বেশি কথা বললে কাশি উঠে যায়। বেশি হাসলেও।

মা তার হাসতে পারে না। কাঁদতেও পারে না। কোনওরকমে হাসপাতালের ডিউটি সেরে এসেই শুয়ে থাকে। কিংবা বারান্দায় টিনের চেয়ারে বসে থাকে। মাসি মাকে কাজও করতে দেয় না। দরকারে মাসির ফুট ফরমাস তাকেই করতে হয়।

সে বলল, চা করতে কতক্ষণ লাগবে। করে দিচ্ছি। আমি তো পারি মা।

মার কাতর গলা—পারিস তো সবই। পারলেই করতে হবে! আমি কি মরে গেছি।

মাসি বুঝল, ঝাঁজ। ছেলেকে কুটো গাছটি নাড়তে দেবে না। নিজেই হয়তো উনুনের ধারে চলে যাবে।

থাক খোকা। যাচ্ছি। ওষুধটা খেয়ে নাও দিদি। সামনে না থাকলে ওষুধও খাও

না। খোকা তুই এখানে এসে দাঁড়া।

কাঞ্চন বুঝল, তাকে পাহারায় রেখে যেতে চায় মাসি। মা যদি আবার ওষুধটা না খেয়ে বলে খেয়েছি। কিছুতেই সময় মতো ওষুধ খাবে না। ওষুধ খেতে ভুলে যাবে।

মা কি ইচ্ছে করেই ওষুধ খেতে ভুলে যায়। না, ওষুধের খারাপ প্রতিক্রিয়া আছে ভেবে খেতে চায় না। যতক্ষণ না খেয়ে পারা যায়। এমনও আশ্বাস খুঁজে পেতে পারে নিজের মধ্যে, দেখি না, না খেয়ে। ওষুধ না খেয়ে যতক্ষণ ভাল থাকা যায়।

নাও খাও।

খাচ্ছি তো।

মা তার দিকে তাকাল। ছেলে তার বেশ লম্বা, তবে গায়ে মাংস নেই। মা তাকে দেখে এমনও ভাবতে পারে। এই এক আফসোস মার। পোড়াকপাল আমার, হয়তো বলল বলে। পুত্রটি তার মতোই রোগা, দুর্বল। হাতে পায়ে এত ঢ্যাংঙা ঠিক যেন তালপাতার সেপাই। সে নিজেও তার শরীর নিয়ে বড় লজ্জায় থাকে। নিজের ঘর ছাড়া সে কখনও খালি গায়ে বের হয় না। বারান্দায় বের হবার সময়ও সে জামা গলিয়ে নিয়েছে। পৃথিবীর সব চেয়ে ক্ষীণকায় মানুষ সে, জামা গায়ে না থাকলে সবাই টের পেয়ে যেতে পারে।

মা পিল খেয়ে জল খেল।

পিল খেয়ে দশ বিশ মিনিট শুয়ে থাকতে হয়। সামান্য পালস বিট বেড়ে যায়। বুক ধড়ফড় করে। শুয়ে থাকলে শরীর সয়ে নেয়।

নাও ওঠো। ধরব!

পূজনকে বল, ঘরে যেন চা দেয়। উঠছি।

মাসি,মা ঘরে চা দিতে বলল।

কিছুটা নিশ্চিন্তি।

ওষুধ খেয়ে যেতে হবে। মা কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারে না, সারাজীবন এমন একটা অসুখ তার সঙ্গী হবে। আগে সিজন চেঞ্জের সময় দু একবার অ্যাটাকটা হত। ইদানীং আর সিজন চেঞ্জ নেই—সময় অসময় নেই অ্যাটাক হচ্ছে। মাও লড়ছে। না, আমার হচ্ছে না। হাঁপায়, কাজ করে। কষ্ট পায় তবু ডিউটি কামাই হয় না। অসুখটাকে মা যে কখন তার প্রতিদ্বন্দ্বী ভেবে ফেলেছে, আর তাকেই শায়েস্তা করার জন্য মাঝে মাঝে ওষুধ না খেয়ে বলছে, খেয়েছি। ওষুধ না খেলে শরীরের উপর কতটা জুলুম সহ্য হয় যেন দেখার ইচ্ছে। জুলুম সহ্য করতে গিয়ে মাঝে মাঝেই বিছানা নেয়। শেষে অসহ্য ঠেকলে ওষুধ ফের নিয়মিত খেতে শুরু করে।

মায়ের মতো কাঞ্চনও খুব পলকা। তারও সর্দি কাশির ধাত আছে। ডাক্তার তাকেও সাবধানে থাকতে বলেছে। আকাশে মেঘ দেখলেই গায়ে চাদর জড়িয়ে রাখে। শীতে ঠাণ্ডায় কাবু। হাত পা গরমই হতে চায় না।

ওষুধের গন্ধ গায়ে মেখে সে বড় হয়েছে। ডেটল, ফিনাইলের গন্ধ তার খুব ভাল লাগে। কোনও কাফ সিরাপ খেতে হলেই ঢাকনা খুলে গন্ধটা নাকে নেয়। কেমন নেশা হয়ে যায় ভিতরে। আসলে মার হাসপাতালেই তার নাড়ি কাটা গেছে। কোজাগরী পূর্ণিমা ছিল— বাবা বলতেন, তোমার কাঞ্চন, সবটাই বাড়াবাড়ি। গেলাম লক্ষ্মীর সরা কিনতে, এসে দেখি ঘর ফাঁকা। জমাদারই খবর দিল, বাবু আপনার পুত্রসন্তান লাভ হয়েছে। লীলাদি পুত্র সন্তান লাভ করেছেন। পূজা পণ্ড করে জন্মালে।

পূজা পণ্ড করে জন্মানো খারাপ না ভাল সে বাবার কথা থেকে বুঝতে পারত না। বাবা তাকে তিরস্কার করছেন, না সে দেবদেবীর তোয়াক্কা না করেই ধরায় নেমে আসায় বাবা তাকে সৌভাগ্যবান ভাবছেন বুঝতে পারত না। অলক্ষ্মীও ভাবতে পারেন।

তবে সে বোঝে অকারণে তার জন্ম। সে কী কাজে লাগতে পারে কিংবা ঈশ্বর যখন পাঠালেনই তখন আর একটু বেশি হজমশক্তি দিলে কী ক্ষতি ছিল। সামান্য খেলেই তার পেট ভরে যায়। আহারে অরুচি। দু' পিস পাঁউরুটি আর এক কাপ চা খেলে বুক গলা আইঢাই করে। দুধ হজম করতে পারে না। পেট মনে হয় ফেঁপে গেছে। খাওয়াটা খুব তার প্রিয় নয়। বরং ওষুধ খাওয়াটা তার বেশি প্রিয়। মার ঠিক উল্টো। একটু বেশি খাওয়া হয়ে গেছে মনে হলেই হজমের বড়ি। অম্বলের ধাত আছে—সে রিসক্ নিতে রাজি না। অ্যান্টাসিড সে সঙ্গে সঙ্গে মুখে ফেলে দেবে।

শরীর দুর্বল বোধহয় এ-কারণেই।

একতলার সিঁড়ি ভেঙে ছাদে উঠে গেলেও হাঁফ ধরে।

মার কী করুণ প্রার্থনা, ঠাকুর ওর শরীরে একটু বল দাও। ঠাকুর কি দ্যান! যে নিজের শরীরের ভারই বহন করতে পারে না, বল দিলে আরও বোঝা হয়ে যাবে না! ঠাকুর ভেবেচিন্তেই এমন কুকর্ম করতে সাহস পান না। মা কিছুতেই বুঝবে না। থানে মানত, গলায় তাগা তাবিজ, ঝাড়ফুঁক, যে যা বলে তাই করে এতটা বড় করে তুলেছে। সে যে সাইকেলে দু ক্রোশ দূরে যায়, তাও মার বিশ্বাস হয় না। একান্ত ভগবান সহায় না হলে সে বোধহয় ফিরেও আসতে পারত না। কারণ মা ছাড়া তার খোলা গা জ্ঞান হবার পর থেকে কেউ দেখেছে বলে মনে হয় না।

মা কেন যে মাঝে মাঝে, তাকে জড়িয়ে বলত, আমার রোগাভোগা ছেলেটা এত কী দোষ করল জানি না, পেট ভরে খেতেও পারে না।

লিভার ফাংশানেই গণ্ডগোল—এই একটা শরীরে, শুধু লিভার নামক বস্তুটির এত গুরুত্ব থাকতে পারে, মা না বললে যেন জানতেও পারত না।

আজকাল সে মাকেও উল্টো খোঁটা দিচ্ছে।

আমার রোগাভোগা মাটা ওষুধ খেতেও ভুলে যায়। কী যে হবে! তার তো ভুল হয় না! ওষুধ ঠিকঠাক না থাকলে সে খেতেই চায় না। আগে ওষুধ—পরে খাওয়া।

সে কোথাও বের হলেও পকেটে নানাবিধ ওষুধ। হজমের বড়ি থেকে অ্যান্টাসিড, এমনকি জ্বর কমানোর ওষুধ থেকে অ্যালার্জির ওষুধ। হাসপাতালে জন্মালে এই বুঝি হয়। বাবা স্কুলে, মা হাসপাতালে, সে হাসপাতালের করিডোরে হামা দিতে দিতে বড় হয়েছে। কোয়ার্টার, হাসপাতাল, রমলা, মালিনী মাসিদের কোলে পিঠে মানুষ। আর সবুজ মাঠের ভিতর কটা আমগাছ। তারপর পটলের জমি, ইস্টিশনের লালবাড়ি এবং রেলের ঝিক ঝিক শব্দ। এত সব আছে বলেই জায়গাটার মায়ায় সে জড়িয়ে গেছে। কোথাও থেকে বাড়ি ফেরার তাড়াও এই এক কারণে। রোগাভোগা মা তার কোয়ার্টারের বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকে অপেক্ষায়। এই ফেরা তার কাছে তীর্থে ফেরার মতো।

কোয়ার্টারের জানালা দিয়ে রোদ এসে পড়েছে মার পায়ের কাছে। দশ বিশ মিনিট শুয়ে থাকলে ওষুধের প্রতিক্রিয়া শুরু হয়। কাশি থাকে না। মা উঠে বসে। চা খায়। বারান্দায় দাঁড়িয়ে সে মার সাময়িক নিরাময়ের প্রতীক্ষা করতে করতে ভাবে, আজ তার কবিতা পাঠের আসর আছে। ফিরতে রাত হতে পারে। যদিও ছোড়দির ইচ্ছে সে একটা গল্প যেন লিখে নিয়ে যায়।

মা।
মা তার দিকে চোখ তুলে তাকায়।
শহর থেকে সীতেশদার বাড়ি হয়ে ফিরব। রাত হতে পারে। চিন্তা কোরো না।
লীলা বোঝে ছেলে তার বড় হয়ে গেছে। মাথায় কে যে ক্যাড়া ঢুকিয়ে দিল!
তুই কি কিছু লিখলি-টিখলি!
ধুস, আমার ও-সব হয় না।
হয় না তো রাত জেগে কী করিস! আমি টের পাই না! পড়াশোনা না করলে চলবে!
করছি তো।
এটাকে পড়াশোনা বলে! আমার তো মনে হয় সারারাত ঘুমাস না। শুধু আজে বাজে কী লিখিস আর ছিঁড়ে ফেলিস।
না হলে কী করব। কিরণদা চেপে ধরেছে। না গেলে খারাপ দেখাবে। কিরণদাকে চেন?
কিরণের কথা বলছিস! চিনব না। মজার ছেলে।
এতক্ষণে মনে হল, কিরণদাকে মা চেনে। দু ক্রোশ দূরে পি এইচ সির এই হলুদ রঙের কোয়ার্টারে তারা ভাল-মন্দ খাবে বলে চলে এসেছিল। ভাল-মন্দ খাওয়াটা বড় কথা নয়, কাঞ্চন নামে এক তরুণের সান্নিধ্য লাভ করা যেন। কেন যে কিরণদা তার এত ভক্ত হয়ে পড়ল সে বোঝে না। কিরণদা, সীতেশদা, ছোড়দি—সবাই।
আকাশের রঙ ভাল নয়। কালো অন্ধকার প্রতিচ্ছায়ায় ভেসে যাচ্ছিল রোহিণী। এই লাইন দিয়ে সে গল্পটা শুরু করেছিল—কারণ ছোড়দির ইচ্ছে সে এবারে যেন গল্প পড়ে শোনায়। গল্পেও তার নাকি দারুণ হাত।
কিরণদা বলেছিল, দারুণ লাইন। তারপর কী!
তারপর কী সেও জানে না, রোহিণী কতটা ভেসে যেতে পারে এখনও সে বুঝছে না। গল্পটা কিছুটা হয়ে থেমে আছে। আর এগোচ্ছে না। তাকে সে মনে মনে রোহিণীই ভাবে। আসল নামে লিখলে ধরা পড়ে যেতে পারে। এই ভয় থেকেই সে রোহিণী নাম দিয়েছে গল্পে। কারণ গল্পের শুরুটা সে জানে, শেষটা কী হবে জানে না।
আমার হবে না কিরণদা।
কী বলছিস? তোর হবে না তো কার হবে?
দ্যাখো তো শরীরে জ্বর আছে কি না। চোখ জ্বালা করছে।
তুই এভাবে বাতিকগ্রস্ত হয়ে পড়ছিস! দেখি কপাল! ধুস, গা ঠাণ্ডা।
কিন্তু চোখ নাক জ্বলছে কেন। জ্বর না হলে হয়! জ্বরটা ঠিকই আছে, তুমি ধরতে পারছ না।
শোন সীতেশের বাড়িতে আমাদের এবারকার কবিতার আসর বসছে। তোর গল্প পড়া হবে। ছোড়দি নিশ্চয় তোকে বলেছে। ভুলে যাস না।
আমার গল্প, বলছ কী? আমি পারব না, আর কে কে পড়বে?
তোর ছোড়দির ইচ্ছে তুই পড়িস। তোকে নিয়ে রসিকতা শুনতে আর আমার ভাল লাগছে না। কিছুতেই পড়তে চাস না। কিংশুকের 'দরবারি সুখ' গল্পটা তুই কি বুঝে লিখেছিস, না, না বুঝে?
কেন কী হয়েছে! খুব খারাপ? গল্প তো লিখি না। কেন যে লিখলাম।
খুব খারাপ, খুব খারাপ না হলে তোর ছোড়দির মাথা খারাপ হয়। তোর ছোড়দি বলে,

ওকে বলো লিখতে। কবিতা লিখছে লিখুক, গল্পও লিখতে হবে। আমরা ছাড়ছি না। দরবারি সুখ শুধু লিখলেই হবে। দরবারি অসুখের কথা লিখতে হবে না। সে কবিতার আসরে আসে, চুপচাপ বসে থাকে, আমাদের তো এমন কথা ছিল না। ওকেও গল্প পড়তে হবে। ওর ভিতরে আগুন আছে, জানো।

আমার ভিতরে আগুন আছে বলছে! মিছে কথা। আগুন থাকলে জ্বলে ছাই হয়ে যেতাম না! ছোড়দির এটা বাড়াবাড়ি।

ভিতরে আগুন না থাকলে, ওরকম গল্প লেখা যায় না। তুই ছাই হয়ে যাবি জানি, তবে লিখতে লিখতে।

তুমি আমাকে খুব ভালবাস। ছোড়দিও আমাকে খুব ভালবাসে। আমি কিছু লিখলেই তোমাদের মনে হয়, এভাবে কেউ আগে জীবনকে ভাবেনি। কী যে পেয়েছ আমার মধ্যে জানি না।

তোর ছোড়দিকে বলবি। ওর কাছে গেলে তো মেনি বিড়াল—সাত চড়ে মুখ থেকে রা খসে না। তারই হুকুম, গল্প না লিখে যেন এ মুখো আর না হয়। গল্প না লিখে নিয়ে গেলে পাষণ্ড ভাববে।

জ্বলতে জ্বলতে ছাই হয়ে যাওয়াটা সে জানে। তার বাবাকে দাহ করার সময় সে তা বুঝেছে। মাধ্যমিক পরীক্ষার সময় বাবা স্কুল থেকে বুকে ব্যথা নিয়ে ফিরল, বাবা অসুস্থ হতে পারে, এটাই সে বিশ্বাস করতে পারেনি। ধরাধরি করে বাবাকে কোয়ার্টার্স থেকে হাসপাতাল পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া গেছে। তারপর সাদা চাদরে বাবার আয়ুকে ঢেকে দেওয়া হল।

বেড নাম্বার দেখে বুঝেছিল কাঞ্চন, লীলা নাম্নী এক যুবতী এক শিশুকে, এই গ্রহের বাসিন্দা করে তোলার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছে এই একই বেডে।

দশ বেডের হাসপাতাল।

গর্ভবতীরা আসে।

একবার সে মাকে খুঁজতে গিয়ে লেবার রুমে ঢুকে দেখে মা হাতে সেলাইনের বোতল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

আরও জোরে কোঁথ দাও। আরও আরও। জননী হবে কষ্ট ভোগ করবে না?

ব্যাঙের মতো চিত হয়ে পড়ে আছে জননী।

আর একটু।

সে কোনওরকমে সরে আড়ালে দাঁড়িয়ে দেখছিল।

'বীভৎস। মধুর। এবং উৎকট দৃশ্য। নরম স্নেহচ্ছায়ায় শিশুর জন্ম হয়—রক্তপাতে অধীরতা থাকে। জঠর বিদীর্ণ করে সে অগ্রসর হয়। লালঝোল রক্তপাতের ছড়াছড়ি। উষ্ণ জলের ধোঁয়া—ধোঁয়া না বাষ্প—তার ঘিলুতে এমন অজস্র ব্যাকরণের ছড়াছড়ি। ব্যাকরণ মানেই যাবতীয় কঠিন অসুখের একটি তালিকা। সে মুগ্ধবোধ থেকে একই গ্রহতারা দেখে আসছে।'

কেন যে এমন সব হয়। পোকারা মগজে কামড়ায়।

কেন যে সে এমন সব ভাবে।

মাথামুণ্ডু থাকে না। মাও জননী হবার সময়—ব্যাঙের মতো চিত হয়ে পড়ে আছে লীলা। দৃশ্যটা তাকে বড্ড কাহিল করে ফেলে, 'কিছুদিন গেলে আয়ু ঢেকে দিতে হয় সাদা চাদরে।'

ইজের পরনে বালক বুঝবে কী করে এই দেখা পুরুষের পাপ অথবা অশ্লীলতা। তবে শিশুরা ভূমিষ্ঠ হয় এইভাবে। ল্যাজ ধরে ঝুলিয়ে রাখা—এবং তার যে কী হয়, মাকে সে আতঙ্কে জড়িয়ে ধরে।

এ মা, তুই এখানে, যা যা। বাইরে যা। ইস, কী ছেলেরে তুই! কখন ঢুকলি! হিরা কোথায়। দরজার ফাঁকে মুখ বার করে চিৎকার—ওকে নিয়ে যা হিরা। পূজন কী যে করে। পূজনের কাছে ওকে দিয়ে আয় হিরা।

আমি যাব না মা।

না, যাও। এখানে থাকতে নেই।

থাকলে কী হয়।

আঃ, যা না বাবা। হিরা, হিরা।

যাই মাসি।

দ্যাখ কাণ্ড। কখন ঢুকে গেছে!

ও তো খুঁজছিল। মা কোথায়। আমার মা কোথায়!

কাঞ্চন বোঝে না, কেন যে তার অস্বস্তি হচ্ছিল মাকে ছেড়ে যেতে। কুঁকড়ে আছে জননী। মা তাড়াতাড়ি শরীর ঢেকে দিয়ে ইঁদুরের বাচ্চাটাকে গরমজলে চুবিয়ে নিল একবার। হিরা মাসি তাকে কোলে নিয়ে এক দৌড়। হাসপাতালের করিডোর পার হয়ে মাঠ পার হয়ে আমগাছের ছায়ায় ছুটছে। সে ক্ষোভে দুঃখে চুল টানছিল হিরার।

হিরা মাসি হি হি করে হাসছে।

পূজনদি, দ্যাখো কাঞ্চনের কাণ্ড। কখন লেবার রুমে ঢুকে গেছে। কী পাজিরে তুই! এ-সব দেখতে আছে! বোকা কোথাকার।

তার জেদ, সে মার কাছে যাবে।

পূজন হতবাক হয়ে বলল, কখন গেল! বাবা বাজার করে সবে ঘরে ফিরেছেন। দুটো ফুলকপি কত সস্তায় এনেছেন, তারই ফিরিস্তি দিচ্ছিলেন পাশের কোয়ার্টারের হেরম্ব সাধুকে। মানুষটা সারাক্ষণ জপতপ করে। গলায় ধবধবে পৈতা। এবং হাতে কোষাকুষি। তিনি একটি নরককুণ্ডে বসবাস করছেন—ফুলকপি সস্তা কি বিনে পয়সায় জানার বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই। মাসি ডিউটি সেরে বাড়ি ফিরলেই কড়া নজর।

ভিতরে যাও।

মালিনী মাসি বাথরুমে যায়।

এই শাড়ি, সায়া, ব্লাউজ, দরজার উপরে থাকল। ডিউটি থেকে মালিনী মাসির বাড়ি ফেরার সময় হলেই তিনি কোয়ার্টারের দরজায় এসে দাঁড়াবেন।

নরককুণ্ড ঘেঁটে এলেন! আমাকে উদ্ধার করে এলেন—তারপর গঙ্গাজলে মালিনী মাসিকে পবিত্র করা শুরু।

মালিনী মাসিকে প্রয়োজনে পেটায়ও। কেন পেটায়, কাঞ্চন বুঝতে পারত না।

আবার আরম্ভ হয়ে গেল!

বাবার ক্ষোভ।

পেটাক। তুমি নাক গলাতে যাবে না।

মা বাবাকে তখন সামলাতে ব্যস্ত। যা মানুষ, নিজেই না লাঠি নিয়ে ছোটে। মেয়েমানুষের কপাল এর চেয়ে ভাল হবে! পেটায় ঠিক, তবে মালিনীও গরম ভাত বেড়ে দিতে ভোলে না।

কাঞ্চনের কাছে এ বড় দুর্জ্ঞেয় রহস্য।

পেটায় ঠিক, তবে মালিনীও গরম ভাত বেড়ে দিতে ভোলে না। মার এমন আফসোসের কথা কেন সে বোঝে না! আফসোস, মাসি এমন বরকে নিয়ে ঘর করছে বলে, না গরম ভাত বেড়ে দেয় বলে!

বাবার অবশ্য আপ্তবাক্য আছে—শরীর হল মহাশয়, যা সহানো হয় তাই সয়। মালিনী মাসির এখন সব সয়ে গেছে। পেটালেই ধুপধাপ, ভাঙচুর, খণ্ডযুদ্ধ—পাশের কোয়ার্টারে সুচ পতনেও কান সজাগ হয়ে ওঠে, আর পেটালে তো পটকা ফাটে না—বোমা ফাটে। মাসি বিন্দুমাত্র হুলস্থুলের পক্ষপাতী নয়। নীরবে সে সব সহ্য করে তাও বোঝা যায়।

আচ্ছা মালিনী মাসি, তুমি কী! লোকটাকে এক ঠেলা মারলে পড়ে যাবে, গায়ে গতরে তোমার কাছে হেরম্ব সাধু শিশু। দাও না একবার, ধাক্কা মেরে ফেলে দাও। নলিনী পারে না! ও তো তোমার মেয়ে। চোখের উপর বাপের অত্যাচার মুখ বুজে সহ্য করে। তেড়ে গেলেই দেখবে পোকা হয়ে উড়ে যাবে।

অবশ্য মাসি পোকা উড়ে গেলে উদোম হয়ে যাবে—এমনও হতে পারে। কিছু করে না, সারাদিন হয় বাড়ি না হয় ইস্টিশনের জিলিপির দোকানে বসে আড্ডা। সন্ধ্যায় বটগাছের নীচে বসে গাঁজা ভাঙ সেবন। দোকানে চাও পাওয়া যায়, জিলিপিও পাওয়া যায়। কালে ভদ্রে শ্রাদ্ধবাড়িতে গীতাপাঠ। গীতাপাঠের সুনাম আছে—এই এক অহঙ্কারে সাধু সব সময় চোখ উল্টে থাকে। মাসির ঘাড়ে বসে খায়, নলিনীকে গীতা পাঠ করে শোনায়—গীতা পাঠেই মানুষের মুক্তি—পুণ্যশ্লোক যে জানে তার কাছে ইহকাল পরকাল সমান। ব্রহ্মলাভ বলে কথা। ব্রহ্মলাভ কি হয়ে গেছে! না হবে! কারণ কাঞ্চন দেখেছে, হেরম্ব সাধু একদিন উলঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে ঘরের মধ্যে। আর মালিনী মাসি পায়ে মাথা ঠুকছে। ঘরে আলো জ্বালা। দরজা জানালা বন্ধ। মুখে সাধুর কল্পবাক্য উচ্চারণ—বন্দ্যভূতং ত্রিলোকেশং তৎ নমামি বৃহস্পতিম।

চৌকাঠে ফাঁক থেকে গেছে—নলিনী ইস্কুলে, বাড়ি ফাঁকা। মা তাকে এক ফালি কুমড়ো দিয়ে বলেছিল, মালিনীকে দিয়ে আয়—লোকটা মালিনীকে শেষ করে দিল! মালিনীকে পথে বসাবে। প্রভিডেন্ট ফান্ড থেকে লোন নিল বাড়ি করবে বলে, কোথায়—সব হজম। কে যে হজম করছে!

মালিনী মাসি তাকেও বুকে জড়িয়ে আদর করতে ভালবাসত। তখন সে বড় হবার মুখে। লোকটাকে তখনও সে দেখেনি। নলিনী তাকে হাত ধরে নিয়ে যেত। মাসি গেলেই বলত, দিদি কী করছে! তোর বাবা নাকি দেশে গেছে। বোস। কী খাবি! নলিনীকে পড়া-টরা দেখিয়ে দে। ও তো কিছু পারছে না।

তাদের কোয়ার্টারগুলো এক ধাঁচের। এক মাপের। তিনটে বড় জানালা, দুটো দরজা, এক ফালি বারান্দা, সরু প্যাসেজ। ঘরে দু'জনের চৌকি পাতলে আর জায়গা থাকে না। চৌকির নীচে ট্রাঙ্ক, বেতের ঝুড়ি চিনেমাটির বাসন, আর দেয়ালে কারও ক্যালেন্ডার, কারও সুচিশিল্পের সম্ভার। মালিনী মাসির দেয়ালে রঙবেরঙের রেশমি সুতোর কাজ। ফটোর মতো বাঁধিয়ে টাঙিয়ে রেখেছে। জোড়া ময়ূরের ছবি—নীচে লেখা, সংসার সুখের হয় রমণীর গুণে।

পতি পরম গুরু—কিছু ফুল তোলা, তার উপরে পতি পরম গুরু হয়ে আছে। পাদোদকের মতো ফুলের ছড়াছড়ি। মালিনী মাসি বড় যত্নে সুচের কাজ করে রেশমি সুতোর ফুল ফল অথবা পাখি সাজিয়ে রেখেছে দেয়ালে।

এই কাঞ্চন শোন।

কে ডাকছে!

সে জানালায় চোখ তুলে নলিনীকে দেখতে পায়। ফ্রক পরা মেয়েটা ডাঁসা আমের মতো গাছে ঝুলছে যেন। ফ্রক গায়ে বেমানান—স্তনে ফাঁপা হয়ে আছে ফ্রকের ভেতরটা।

আমাকে ডাকছিস! কেন রে!

আয় না।

ইস জানালা দিয়ে যে হাওয়া ঢুকছে। বন্ধ করে দে।

মা তোকে ডাকছে। জানালা বন্ধ করে বসে থাকিস কী করে? তুই তো অন্ধকারের পোকা হয়ে যাবি রে। আলো সহ্য করতে পারবি না।

তোর শীত করে না? আমার শীত করছে। জানালা বন্ধ করে দে। ঠাণ্ডা আসছে।

ঠাণ্ডা তোর বের করছি। ওঠ।

আমার যে কেন এত শীত করে। খুব ঠাণ্ডা লাগছে।

তোর শীতটা একটু বেশি। ডেসিমেলের অঙ্ক মাথায় ঢুকছে না। মা বলে গেছে, তোর কাছে বুঝে নিতে।

আমার যে শীত করছে।

নলিনীর চোখ কুঁচকে যায়। না যাবার ফন্দি। মা, লীলা মাসি সবাই এত করে বলেছে বলেই সে যেন আসে। মাথায় না ঢুকলে কী করবে। টেবিলে বসে থাকতেও ভাল লাগে না। বই খাতা নিয়ে তার কাছে এলে পূজন মাসির কড়া চোখ—কিছুতেই কিছু হচ্ছে না বলে ওর নিজের ঘরে নিয়ে যেতে চায়।

কাঞ্চনের বুক ধুকপুক করে।

খাতাটা নিয়ে আয়। দেখি পারি কি না।

না, ঘরে চল। খাতা তোর ঘরে নিয়ে আসতে পারব না। মা ডিউটিতে। চল না। ভয় পাস কেন বলত! পড়া না পারলে রক্ষিত মাস্টার কান ধরে উবু করে রাখে। তোর খারাপ লাগে না! মাসি শুনে বলল, কাঞ্চনের কাছে বুঝে নিতে পারিস তো সব। তোকেও তো মাসি বলেছে। কী বলেনি, বল। মাও বলেছে। ঘরে যেতে বললেই তোর এক কথা, শীত করছে।

আসলে কাঞ্চন জানে, ওর জামা খুলে ফেলতে পারলে নলিনীর বেজায় আনন্দ। একবার রেল-লাইনের ধারে চেষ্টা করেছে—পারেনি। ওরা গেছিল মালঞ্চের মেলায়। সবাই মিলে গেছে—একসঙ্গে বড় হলে যা হয়, নলিনী আর সে মেলায় ঘুরেছে, কাচের চুরি পরেছে। লাল ফিতে কিনেছে। আলতা, স্নো, পাউডার, গন্ধতেল, এবং একটা ছোট্ট আরশি।

নলিনীদের ঘরে দেয়াল-আর্শি আছে। আবার একটা ছোট আরশি কেন। কী হবে?

আয়নাটার রহস্য সে বুঝতে পারেনি।

নলিনী আরশি কিনে বলেছিল, মাকে কিন্তু বলিস না।

আরশি গোপনে কেনার কী কারণ থাকতে পারে তার মাথায় ঢুকছিল না। মেলা থেকে ফেরার সময় মাঠে পড়তে হয়, শালবন পার হতে হয়। শালবন পার হয়ে গেলে রেল-লাইনে পড়া যায়। নলিনী আর সে পেছনে, মা মাসিরা আগে—রাস্তাঘাট ফাঁকা। বনের ভিতর ঢুকলে আরও ফাঁকা।

মাসি জানে না, চুরি, লাল ফিতে, স্নো, পাউডারের সঙ্গে নলিনী একটা আরশি কিনেছে গোপনে। তার কৌতূহল—কেন গোপন রাখছে, আরশি পছন্দ হলে কেনা যেতেই পারে। দোষের কী, এমন কী অপরাধ আরশিতে লুকিয়ে আছে, যার জন্য নলিনী বারবার বলেছে, খবরদার মা যেন জানে না।

জানলে কী হবে!

তোর মুণ্ডু হবে। মা জানলে, অনর্থ হবে। আমি বড় হয়ে গেছি বুঝতে পারবে। বাথরুমে আয়না দরকার হয়। আয়নায় চুরি করে নিজেকে দেখতে কী যে ভাল লাগে। আমার মেজমাসির বাথরুমে আয়না আছে জানিস।

বাথরুমে আয়না। বাথরুমে চান-টান করা যায়, আয়নায় বাথরুমে মুখ দেখে কী লাভ। সে তো চান-টান সেরে ঘরে এসে মাথা আঁচড়ায়। তার কোঁকড়ানো চুলে কাঁকুই ভাঙে বলে, মা হাড়ের শক্ত একটা চিরুনি কিনে বলেছে, চুল তো নয়, ঘাসের জঙ্গল। দেখি কী করে ভাঙে।

জানিস আমার মেজমাসি বাথরুমে গেলে ঘণ্টা কাবার করে দেয়। ঢুকলে আর বেরই হতে চায় না। বাথরুমের দেয়ালে ছোট্ট কাচের আলমারি। স্নো পাউডার, গন্ধ তেল, কতরকমের লোশন—আর একটা বড় আয়না।

ওটা তোর মাসির প্যান্ডোরার বাক্স। ওখানে বেশি খোঁজাখুঁজি করলে একটা সাপও কুণ্ডলি পাকিয়ে থাকে। হাত দিলে ছোবল খাবার আশঙ্কা আছে।

সাপটা তুই ওখানে রেখে এসেছিস! বুদ্ধু কোথাকার।

বলেই হাত ধরে হ্যাচকা টান। তারপর জঙ্গলের ভেতরে অদৃশ্য। সে যায়নি। হাত ছাড়িয়ে নিয়েছে। রাস্তায় একা দাঁড়িয়ে। হাসপাতালের দলটা আগে চলে গেছে। সে ডাকল, নলিনী, কোথায় তুই।

রেলপাড় দিয়ে যাব। আয়।

তা মন্দ না। তার বনজঙ্গল খারাপ লাগে না। সাঁঝ লেগে গেছে। রেল-লাইন ধরে গেলে সোজা হয় রাস্তাটা। সময় কম লাগে। শালের পাতা উড়ছে। এবং পাখিরা উড়ে যাচ্ছিল—নীরব বনভূমি বলা যায়, গাছের ডাল পাতা হাওয়ায় নড়ছে। কাঠঠোকরা পাখি কুট কুট করে কাটছে কাঠ। কিছুটা জঙ্গলে ঢুকেই সে বুঝল নেহাত বোকামি ছাড়া কিছু না। নলিনীর মাথায় কোনও কুমতলব যে নেই কে বলবে। বড় হতে হতে তার জামা খুলে ফেলার কম চেষ্টা করেনি। সে তার শরীর ঢেকে রেখে ক্ষীণকায় মানুষের জন্য কোনও করুণা চায়নি। জামার আস্তিন উঠে গেলেও সে শঙ্কিত হয়ে পড়ে। হাড় ছাড়া চামড়া ছাড়া তার বিশেষ সম্বলও নেই। মুখখানা তার অথচ এত সতেজ এবং সুষমায় ঢাকা যে মনেই হয় না, সে একজন অস্থিচর্মসার মানুষ। রোগাভোগা মানুষ।

সে জঙ্গলে দাঁড়িয়ে পড়েছে।

আবার জঙ্গলের ভিতর থেকে চিৎকার, কাঞ্চন, ছোট আরশিটা যদি দেখতে চাস আয়।

ছোট আরশি কিনেছে, দেখেছেও। আবার কেন বলছে আরশিটা যদি দেখতে চাস, আয়। সে চিৎকার করে বলতে পারেনি, না যাব না। খুব জোরে কথা বলার অভ্যাসও তার নেই। কী জানি, জোরে কথা বললে, শিরা-উপশিরায় যে বিস্ফোরণ ঘটবে না, রক্তবমি হবে না, কিংবা দুবলা মানুষের উচিত নয় চিৎকার করে কথা বলা। এতে টের পেয়ে যেতে পারে, সে বাইরে দুবলা হলেও, ভিতরে দুবলা নয়। তবু আরশি দেখার আতঙ্কে কিছুক্ষণ সে ম্রিয়মাণ ছিল—কখন যে ভুস করে জঙ্গলের ভেতর থেকে নলিনী

উঠে দাঁড়াল, আর ওর হাত ধরে ছুটে নিয়ে চলল, বুঝতেই পারল না।

আর কেবল বলছে, আরশিতে কত মজা আছে জানিস। এতে হাত দিলে, তোর শরীরে আগুন জ্বলে উঠবে। চল পরখ করে দেখবি। মিছে কথা বললে, আমার নামে কুকুর পুষবি। নলিনী কখনও মিছে কথা বলে না।

যাঃ, আরশি ছুঁলে শরীরে কখনও আগুন জ্বলে!

জ্বলে রে।

তা হলে হাত দিতে বয়ে গেছে। পুড়ে মরতে কে চায়।

চায়। জেনেও পুড়ে মরতে চায়। আমার মাকে দেখে বুঝিস না। তোর মাকে।

মা মাসিদের কথায় সে কিছুটা ক্ষুব্ধ। কিন্তু তার এই যে স্বভাব, ক্ষুব্ধ হলেও মেজাজ নিয়ে কথা বলতে পারে না—এটা নলিনী ভালই জানে। নলিনী জেনেই ফেলেছে যেন সে ক্যাচাকলে পড়ে গেছে। নলিনীকে ফেলে জঙ্গলের রাস্তায় রেল-লাইনে একা একা উঠে যাওয়া কঠিন। তার নানা অপদেবতার ভয়ও আছে। ভূতপ্রেতের ভয়ও কম নেই। রেল-লাইনে গলা দিয়েছে সেদিন ফার্মাছিস্টবাবুর বউ। কাকিমা বলে ডাকত। কেন গলা দিল! লাশ সে দেখেছে। রেলের ধারে উঠে গেলে জায়গাটা সে দেখতে পাবে। ফেরার পথে এমন ভূতের রাস্তায় শেষ পর্যন্ত নলিনী কেন যে তাকে তুলে নিয়ে এল।

সে ডাকল, নলিনী।

বল।

আরশি দেখা কি খুবই জরুরি। চল ফিরে যাই।

আমি কিছু জানি না। দাঁড়িয়ে থাকলি কেন! হাঁট, এই তো এসে গেছি। রেল-লাইন দেখা যাচ্ছে।

ওখানে ভুতুরে শ্যাওড়া গাছ আছে।

জানি। লক্ষ্মী কাকিমা গলা দিয়েছিল। রেল-লাইনের শ্যাওড়া গাছটায় লক্ষ্মী কাকিমা পেত্নি হয়ে আছে ভাবছিস! ঘাড় মটকে দেবে ভাবছিস।

আর সে বোকার মতো কেন যে লাইনে উঠে যাবার আগেই দৌড়েছিল। কাকিমা নলিনীর বেশ ধরে জঙ্গলটায় নিয়ে আসেনি কে বলবে! নলিনী হয়তো অনেক আগেই বাড়ি পৌঁছে গেছে। নলিনী সেজে কাকিমা তাকে শ্যাওড়া গাছটার নীচে নিয়ে কী করবে কে জানে। ভূতের ভয়ে ওর শরীর ফুলে উঠেছিল। কিছুটা ধূসর অন্ধকার—দূরে সিগন্যালের বাতি, আর একটু এগোলেই গুমটি ঘর, গুমটি ঘরে পীতাম্বর নীল লণ্ঠন জ্বালিয়ে যদি দাঁড়িয়ে থাকে।

না কেউ নেই। না দূরের গুমটি ঘর, না নীল লণ্ঠন। শুধু লাইনটা বেঁকে নিখোঁজ হয়ে গেছে দূরের তেপান্তরে। আর টের পেল তার কোমরে ঝুলে পড়েছে কেউ। কাকিমা নলিনীর বেশে তার কোমর জড়িয়ে বলছে, তুই কী রে, আমাকে ফেলে চলে যাচ্ছিস। হাঁপাচ্ছিস কেন।

ছাড় বলছি। কেমন ধূসর হয়ে আছে পৃথিবী। মা চিন্তা করবে।

আমাকে ফেলে যাবি কোথায়। দাঁড়া না। আরে আচ্ছা ছেলে তো, তোকে আমি খেয়ে ফেলব! এত ছটফট করছিস কেন?

সে জোরজার করেও কোমর থেকে হাত দুটো ছাড়াতে পারছে না।

তুই নলিনী কি না সত্যি করে বল।

আমি নলিনী। চেয়ে দ্যাখ।

কাকিমা যদি....

ধুস। দ্যাখ না। বলে নলিনী ফ্রক খুলে দেখাল। যেন সে কাকিমার স্তন আর নলিনীর স্তন দেখে ফারাকটা বুঝতে পারবে।

কিশোরী মেয়ের স্তন আর মাঝবয়সী নারীর স্তনে ফারাক থাকে,তবে সে কিছুই ভাল জানে না। ঢাউস দুটি স্তন এতদিন কী করে যে গোপন হয়ে আছে ফ্রকের ভিতর! বোধ বুদ্ধি তার লোপ পাচ্ছিল। সে কিছুটা ক্যাবলাকান্ত হয়ে গেছে। লাইন ধরে মানুষজনের চলাচল খুবই কম। নলিনী টানতে টানতে ঘাসের মধ্যে ফেলে দিল তাকে।

তুই কি আমাকে মেরে ফেলবি ঠিক করেছিস। জামা টানছিস কেন। না জামা খুলবি না। বোধবুদ্ধি শূন্য হলেও জামা খুললে খুবই ক্ষীণকায় সে, ধরা পড়ে যাবে। তার লজ্জা করছিল। নলিনীকে দেখে তার ভিতর এতটুকু কৌতূহলের লেশমাত্র নেই। খুবই স্বাভাবিক ঘটনা। তরলমতি বালিকারা সব করতে পারে। জামা প্যান্ট নিয়ে টানাটানিও করতে পারে।

আত্মরক্ষা ছাড়া তার উপায় নেই।

সে দু-হাতে তার প্যান্ট জামা চেপে রেখেছে। নলিনীকে বড় বেয়াহা এবং দজ্জাল মনে হচ্ছে। খারাপ মেয়ে মানুষ মনে হচ্ছে। এক সঙ্গে বড় হয়েছে বলে, পাশাপাশি কোয়ার্টারে থাকে বলে, নলিনীর এত জুলুম!

তুই ছাড় নলিনী। আমি চিৎকার করব।

কর না। কেউ শুনতে পাবে না। কচি খোকা!

আমাকে তুই মেরে ফেলতে চাস।

তুই কী রে। আর্শিটা দ্যাখ। আগুন জ্বলছে। হাত দিয়ে দ্যাখ। তোকে মেরে ফেলতে আমার বয়ে গেছে।

না। আমি কিছু দেখব না। হাত দেব না। জ্বলছে জ্বলুক। আমার বমি পাচ্ছে। ছাড় বলছি। দাঁড়া, মাকে সব বলে দেব। তোর আরশি নিয়ে তুই থাক।

তারপর সত্যি তার ওয়াক উঠে এল। কী বীভৎস দেখতে। উবু হয়ে বসতেই উৎকট গন্ধে তার দম বন্ধ হয়ে আসছিল—নলিনী তার বুকে চেপে বসেছে—সে ধড়ফড় করে এক হ্যাঁচকায় নলিনীকে ছিটকে ফেলে জামাপ্যান্ট কোনওরকমে সামলে দৌড়াল। নলিনীও জামা প্যান্ট পরে পিছু পিছু ছুটছে।

॥ ২ ॥

হাত ফসকে গ্লাসটা পড়ে যাওয়ায় মেঝে জলময় হয়ে গেল। তাড়া নেই, ধীরেসুস্থে কাজ করলেও চলে—তবু দ্রুত ঘরটা ছিমছাম করে তোলার জন্য মিঠু সামান্য বাড়াবাড়ি করে ফেলল। গ্লাস পড়ে গেলে জল গড়াবেই। জলের আর কী দোষ। মিঠু নিজে সকাল থেকে তদারক করছে।

সীতেশের আজ ছুটি। ছুটির দিনটা সে তার ঘরে বসে লেখাপত্র নিয়ে ব্যস্ত থাকে। বার্ষিক সাপ্তাহিক কাগজগুলি উল্টেপাল্টে দেখে। কবিতার বাই আছে। কলকাতার একটি কাগজে তার কবিতা ছাপা হয়। ইদানীং গল্প মকস করছে। মিঠুকে পড়ে শুনিয়েছে।

রাতে বিছানায় শুয়ে বেশ পরিপাটি করে বেড ল্যাম্প জ্বালিয়ে গল্পটি সীতেশ মিঠুকে

শুনিয়েছিল। গল্পের গদ্যরীতি এবং বিষয় খুবই টাটকা এবং তাজা। মিঠু নিশ্চয়ই তার প্রতিভায় বিস্মিত হয়ে যাবে। কবিতায় তার হাত মন্দ না। কিন্তু কবিতা লিখে কিছু হয় না, ইদানীং এসব মনে হওয়ায়, সে গল্পে হাত মকস করার চেষ্টা করছে। সে আশা করেছিল, গল্প শুনে মিঠু ওকে জড়িয়ে ধরবে। কিন্তু অবাক, কোনও সাড়া নেই।

এই। শুনছ।

সাড়া নেই।

সে ঠেলে দিল মিঠুকে।

আরে এ তো, ঘুমিয়ে পড়েছে। নাইটি হাঁটুর উপর উঠে গেছে কিছুটা। সে প্রচণ্ড খেপে গিয়েছিল, তবে মিঠুর কাছে রাগ প্রকাশ করতে পারে না। গল্পের বৃদ্ধ মানুষটি মিঠুকে এতটুকু বিচলিত করেনি। নাইটি এতটাই উঠে আছে যে অন্য সময় হলে প্রলুব্ধ না হয়ে পারত না। বিরক্ত কিছুটা। গল্পটি শোনার আগ্রহ মিঠুর বিন্দুমাত্র নেই—কিংবা একঘেয়ে প্যানপ্যানানি কাঁহাতক সহ্য হয়, গল্পের চরিত্ররা মিঠুর মধ্যে বিন্দুমাত্র কৌতূহল সৃষ্টি করেনি। এটা ভাবতেই সে কিছুটা দমে গিয়েছিল। ভেবেছিল বেডল্যাম্প জ্বালিয়ে মিঠুর ঘুম ভাঙিয়ে দেওয়া যায় কি না। অবশ্য আলো জ্বালা রাখলেও ক্ষতি নেই। সে উঠে বসেছিল। চিবুকে সুড়সুড়ি দিয়েছিল। তারপর সাপটে ধরেছে।

কপট নিদ্রা! এমনও মনে হয়েছিল সীতেশের। কপট নিদ্রা যে যায়, তাকে জাগানো খুবই কঠিন। কিছুটা অন্যমনস্ক হয়ে বলার মতো, সকালে কত কাজ! ঘর থেকে চেয়ার টেবিল বের করে দিতে হবে। শুনছ। এই মিঠু, মিঠু।

আলতো করে মিঠুর মুখ হাঁটুর উপর তুলে চুমো খেতে গিয়েও সীতেশ কেন যে কোনও আগ্রহ বোধ করল না। খোঁপা ভেঙে গেছে অথচ চোখ মেলছে না। ভেতরে অভিমান। পর পর দুটো গল্প লিখে শুনিয়েছে, মিঠু নিমরাজি মুখে বলেছে, মন্দ কী, ভালই তো। কবিতার অনুপ্রেরণা বলতে গেলে মিঠু। মিঠুকে খুশি করার জন্য কবিতার সৃষ্টি, এবং সৃষ্টির আনন্দ-অবগাহনের মতো মিঠুকে পবিত্র করে রাখা সারারাত।

গল্প লিখে সুখ পাচ্ছে না। মন ব্যাজার। মিঠুর মধ্যে আশ্চর্য এক রুচিবোধ কাজ করে। ভাল লাগলে দু এক কথায় তার একসপ্রেশান অনবদ্য। এ-জন্যই দাম দেয় তাকে। অথচ মিঠু ঘুমিয়ে পড়ল। কেন যে সব তার অর্থহীন লাগছিল। বোধ হয় সে ছিঁড়েই ফেলত—আর তখনই মিঠু কপট নিদ্রা থেকে ঝটকা মেরে উঠে বসল। মুখে দুষ্টু হাসি।

এতে সে আরও রেগে গেছিল।

না হবে না।

কেন হবে না। বেশ তো লিখেছ।

বেশ বলছ।

খুব ভাল হয়েছে। তোমার হবে।

বলছ হবে।

হ্যাঁ হবে।

মিঠুকে জড়িয়ে ধরতে গেলে হাই উঠল তার। হাত সরিয়ে বলল, ভাল লাগছে না। সকালে উঠতে হবে সীতেশ। কেন যে পাগলামি শুরু করলে বুঝি না।

এমনিতে বেলা করে ঘুম ভাঙে মিঠুর।

কাল সকাল সকাল উঠতে হবে। আজ থাক। রাগ করছ না তো!

সীতেশ আর কী করে। চটিতে পা গলিয়ে বাথরুমে গেল। মুখে ঘাড়ে জল দিল। মিঠুর পাশে শুয়ে চুপচাপ ঘুমানো কঠিন—প্রাণবন্ত সুন্দরী তার শুয়ে আছে, অথচ হাত দেওয়া যাবে না। ওর অনিচ্ছে প্রবল হলে ছটফট করা ছাড়া উপায়ও থাকে না।

আসলে কি মিঠু তাকে খুশি করার জন্য বলেছে—তোমার হবে। হতেও পারে। মেয়েদের কপটতা সে তত বুঝতে পারে না। সকালে মিঠুই তাকে বলেছিল, এই ওঠো। কত কাজ।

কাজ মেলা। আপাতত খাট একদিকে সরিয়ে দিতে হবে। জানালার পর্দা পাল্টে দিতে হবে। সতরঞ্জ পাতা হবে লম্বা করে। আলিগড় থেকে আনা কারুকাজ করা পেতলের ফুলদানি, রজনীগন্ধার গুচ্ছ, দেয়ালে হুসেনের বুদ্ধের ছবি, আর কী রাখা যায়, দুটো তাকিয়া, সাদা ফরাস, এবং জানালা পার হলে ঝিলের জলরাশি, যে আসবে দেখবে অথচ গ্লাসটা পড়ে মেঝেতে জল, সতরঞ্জ ভিজে গেল, সাদা ফরাস ভিজে গেল—এখন কী হবে! জলের গ্লাসটা হাত থেকে ফসকেই বা গেল কেন! মিঠু ভারী বেকুফ। কিছুটা অপ্রস্তুতের গলায়—কী হবে! আরে তুমি বসে সিগারেট টানছ। ধর। সব যে ভিজে যাবে। মিঠু হাঁটু গেড়ে সতরঞ্জ সরাতে থাকল।

গ্লাসটা পড়ল কী করে!

অত কৈফিয়ত দিতে পারব না। আমি মরছি নিজের জ্বালায়। এখন কী হবে!

রোদে শুকিয়ে নিলেই চলবে। ধর। বলে সীতেশ সতরঞ্চ তুলে ছাদে নিয়ে গেল। মেলে দিল ছাদে। সকালে ঝিল থেকে ফুরফুরে হাওয়া উঠে আসে। হাওয়ায় গা জুড়িয়ে যায়। লোডশেডিং-এ এই ছাদ তারা ব্যবহার করে। গ্রীষ্মের গরমে জ্যোৎস্না রাতে মিঠুকে পাশে নিয়ে শুয়ে থাকতে খুবই আরাম। রাতে কেন যে গায়ে হাত রাখতেই এত চটে গেল বুঝতে পারছে না। সামান্য অনুষ্ঠান, এত সকাল সকাল ঘর সাজাবার কী দরকার ছিল—এ যে প্রায় রাজসূয় যজ্ঞ ভাবছে মিঠু।

গ্লাসটা পড়ে যাওয়ায় যেন সে চোখে সর্ষেফুল দেখছে। আরে সেই সাঁজবেলায় অনুষ্ঠান, আগে কে কে আসে দ্যাখ। সবাইকে বলা হয়েছে, কমলদা, গোষ্ঠদা, সমরদা—এরা শহরের সব ডাকসাইটে লেখক, প্রবন্ধকার, সমালোচক। কমলদার দুটো ফিচার এবার কলকাতায় নামী পত্রিকায় ছাপা হওয়ায় অনুষ্ঠানে আসাটা খুবই জরুরি। কিরণদা নিজে গিয়ে একবার বলে এসেছে, সেও কলেজ থেকে ফেরার পথে কমলদার বাড়ি হয়ে এসেছে। কার্ডে নামও ছাপা হয়ে গেছে। তিনিই মধ্যমণি—শহরের এবং আশপাশের হবু কবি, গল্পকারদের ভিড় হবে। এই সময় একটা জলের গ্লাস পড়ে যাওয়া খুবই যেন বেমানান।

মিঠু ছাদে উঠে এসেছে। যেন তাকে বিশ্বাস করতে পারছে না। ছাদে মেলে না দিলে, রোদে শুকোবে না। ভিজা সতরঞ্জ থেকে চিমসে গন্ধ উঠতে পারে।

সীতেশ বলল, শুকিয়ে যাবে। কিন্তু কথা হল, এত সকালে সতরঞ্চ পাততে গেলে কেন?

দেখছিলাম।

কী দেখছিলে?

কতটা জায়গা ধরে। দুটো চাদরে হবে, না আরও লাগবে।

ডাবল খাটের দুটো সাদা চাদর যথেষ্ট। দরকারে না হয় কিরণদাকে বলা যেত।

কিরণদাকে বলতে হবে কেন। ওই এক কিরণদা পেয়েছ যা হোক। ভাগ্যিস

ছিলেন। ব্যাচেলার মানুষ, সামান্য চাদর শেষ পর্যন্ত তাঁকে সাপ্লাই করতে হবে। তোমার কি চাদরের এতই অভাব!

গ্লাসটা কি হাত থেকে ফসকে গেল! না ইচ্ছে করে ফেলে দিলে আমার উপর রাগ করে।

যেতে পারে, নাও পারে। ধর ইচ্ছে করেই ফেলে দিয়েছি।

তুমি সে পাত্র নও মিঠু। তোমার ইজ্জত নিয়ে ভাবছিলে। তোমার সুন্দর বাড়িটা আজ সাজিয়ে তুলতে চাও। বেচারা রাখহরি কাল থেকে দম ফেলতে পারছে না। বাগানে ডালিয়া, ক্রিসেন্থিমাস, জুঁই আর রজনীগন্ধার ঝাড়ে বাড়ির বাহার এমনিতেই খুলে গেছে। দুর্লভ সব ক্যাকটাস এনে সিঁড়ির দু'পাশে সাজিয়ে রেখেছ। দেয়ালে কোনও দাগ থাকুক তুমি চাও না।

হয়তো হবে।

তবে ইচ্ছে করে হাত থেকে কেউ জলের গ্লাস ফেলে দেয় না। অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলে। জল খাবে বলে রাখহরি ভর্তি গ্লাস দিয়ে গেল, আর হাত থেকে তা ফসকে গেল। নামী শিল্পীদের ছবির প্রিন্ট সিঁড়িতে ওঠার মুখে, এবং ঘরের দেয়ালে—এই ঘরটা তোমার খুব প্রিয় জানি, নীচের ঘরগুলো ফাঁকা, বসার ঘরটাও তোমার কম বড় নয়—তবু নিজের শোবার ঘরটাই অনুষ্ঠানের জায়গা হয়ে গেল।

ঘরটায় অনেক জায়গা। নীচের কিংবা উপরের ঘরগুলিতে অত জায়গা কোথায় বল।

সিঁড়ির মুখে পেতলের ভাসে দেখলাম দুটো বনসাই। বাড়িতে তো ও দুটো ছিল না। কে দিল।

অপর্ণাদির কাছ থেকে চেয়ে এনেছি।

ফেরত দিতে হবে!

নাও দিতে পারি। অপর্ণাদি আসবেন বলেছেন। যা দরকার লাগে আনতে বলেছেন। অত বড় সতরঞ্চ পাব কোথায়। অপর্ণাদির বেসিক স্কুল থেকে আনিয়ে দিয়েছে। স্কুলের ছেলেরা ওতে বসে প্রেয়ার করে।

সকাল থেকেই, ঠিক সকাল বলা চলে না, একটু বেশি সকালেই মিঠু আজ উঠে পড়েছে। কিচেনে ঢুকেছে। কিচেনের কাবার্ড খুলে সব কাপ ডিশ বের করে দিয়েছে। ডাইনিং স্পেসে খাবার টেবিলে সাদা চাদর, গ্লাস ঝকঝকে, ভাঁজ করা রুমাল—এক হাতে সব সামলাতে হচ্ছে। উপরে উঠে রাখহরি আর সে টেবিল চেয়ার টানাটানি করেছে। টেবিল চেয়ার টানাটানির সময়ই তার ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। একবার বলতে ইচ্ছে হয়েছিল, এগুলো বাড়াবাড়ি—তোমার কাব্যপ্রীতি আছে, তোমার মানুষটিরও সাহিত্যপাগল স্বভাব—তাই বলে, এতটা বাড়াবাড়ি ঠিক না।

বাড়াবাড়ি কি রোজ করি! একটা তো দিন। কে কবে আবার আমার বাড়ি আসবে! আর কেউ এলই যদি, দৈন্য ফুটে উঠবে কেন। মিঠুর মুখের দিকে তাকিয়ে তার এমন মনে হয়েছিল। মিঠুর গলার স্বর মিষ্টি—তার দরাজ গলায় মাঝে মাঝে বাগানে ফুল পর্যন্ত ফোটে।

এত মিষ্টি গলা, নিজের খুশি মতো গায়, কারও অনুরোধে গায় না। মিঠু রবীন্দ্রসঙ্গীতের তালিম নিয়েছে বলেও জানে না। আশ্চর্য সে হারমোনিয়ামও বাজাতে পারে না। অথচ তাল লয় সব এত নিখুঁত যে মনেই হয় না, সে কারও কাছে তালিম

নেয়নি। ঈশ্বরপ্রদত্ত এই গুণটির বিকাশেরও তার কোনও চেষ্টা নেই।

মনের খুশিতে গায়, মনের বিষাদেও গায়।

আজকাল ওর মধ্যে বিষাদের ছায়া যেন একটু বেশি। খুশিতে গাইলে, সীতেশ বলবে, বাগানে কোনও ফুল ফুটল? বিষাদে গাইলে বলবে, বাগানে আজ কোনও ফুলের পাপড়ি ঝরে গেল।

সেই মেয়ের হাত থেকে গ্লাস পড়ে গেল! জলে ভেসে গেল মেঝে। কোনও যেন অকল্যাণের মেঘ ছেয়ে গেল তার সারা আকাশে।

পিতলের ভাস দুটো রাখা হয়েছে কারুকাজ করা টিপয়ে। টিপয়ের নীচে ঝুঁকে দেখছে—ঠিকমতো বসানো হয়েছে কি না—সামান্য ঠেলা খেলে পড়ে যেতে পারে। টিপয় নেড়েচেড়ে বুঝল, না টলছে না—সিঁড়ির সব ধাপে তার এই সব সৌন্দর্যের জন্য সহসা একটু বেশিমাত্রায় কেন যে ভীত হয়ে পড়ল মিঠু! উঠতে গেলে পায়ে ঠোক্কর খেতে পারে ভেবে সে ক্যাকটাসের টবগুলো দেয়ালের সঙ্গে প্রায় সেঁটে দিচ্ছে। সিঁড়ি ধরে ওঠার মুখে, দেয়ালে নানারঙের ছবি দেখতে পাবে। ছবিগুলি অধিকাংশ জলরঙের। বইমেলা থেকে কিনে এনেছে, বাঁধিয়ে রেখেছে। ছবিগুলির নামও অদ্ভুত—মৃত্যু, অপহরণ, অলঙ্কার, ফুটপাথ, গোলাপে কীট, কবিতার তরঙ্গ, শেষের ছবিটার নীচে লেখা নরখাদক।

ঠিক সিঁড়ির ওঠার মুখে ছবিটা ঝুলছে।

ছবিটা বোঝা কঠিন। কোনও নরখাদক নেই, আশ্চর্য এক রমণী অন্তঃসত্ত্বায় কাতর। চোখে মুখে বিষাদ অথচ আবার এক স্নেহ-মমতার ছটা মুখে। নরখাদক নাম কেন রাখলেন শিল্পী সে জানে না, মিঠু জানে কি না জানা নেই। টুলে উঠে সে আঁচলে ছবির কাচ মুছে দিয়েছে। বেশ ঘাম হচ্ছে মিঠুর।

মেয়েদের কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখলে সীতেশ কেন যে কামুক হয়ে পড়ে।

ওর ইচ্ছে হচ্ছিল পাঁজাকোলে তুলে নেয় অনন্তযৌবন এবং খুঁটে খুঁটে খায়। সে তার যুবতীর কাছাকাছি থাকছে। ফুটফরমাস খাটছে। কাঠের সিঁড়িতে মিঠু উঠে গেছে উপরে। সিলিঙের কাছাকাছি দুটো ছবি। ওর মা-বাবার। দু'জনই এ-বাড়িটায় বহু বছর থেকে গেছেন। যুবতী তাদের গলায় সতেজ রজনীগন্ধার মালা পরাবে বলে উপরে উঠে গেছে। সিঁড়ি ধরে আছে সে। শাড়ির নীচে উরু দেখা যায়। সে সামান্য ঝুঁকে নিচু হতে গেলেই মিঠুর তর্জন—কী অসভ্যতা হচ্ছে! ঠিকমতো ধরো।

ঠিকই তো ধরেছি।

এটাকে ঠিক ধরা বলে! মাথা ঝুঁকে আছে কেন!

আরে মুশকিল, চেপে ধরতে গেলে মাথা ঝুঁকবে না।

না। ঝুঁকবে না। এত নীচে কিছু নেই।

আছে।

আছে। বের করছি তোমার অসভ্যতা।

মিঠু শাড়ি দু'পায়ের ভাঁজে সাপটে নিল। খুনসুটি করার আর সময় পেলেন না তিনি।

সীতেশ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, এত চাপাচুপি! আমাকে অবিশ্বাস। রাখহরি, এই রাখহরি। কোথায় যে যায়।

আজ্ঞে যাই বাবু।

রাখহরিকে ডাকার কী হল।

ও থাকুক। আমার ধরা যখন পছন্দ হচ্ছে না।

কাঠের সিঁড়ির শেষ ধাপে প্রায় উঠে গেছে মিঠু। ছাদের নীচটায় সামান্য ঝুলকালি কিছুতেই ফুলঝাড়ুতে সাফ করতে পারেনি। ঝাঁটা দিয়েও নয়। কারও চোখে পড়ারও কথা নয়। অথচ মিঠুর সতর্ক নজর এড়িয়ে যেতে পারেনি। আর কি না এ-সময় তিনি রাখহরিকে ডাকছেন। তাকে সিঁড়ি চেপে ধরতে বলছেন। মজা করার মাত্রা বুঝবে না! তর তর করে সিঁড়ি থেকে নেমে আসছে মেঘলা আকাশের মতো। গম্ভীর।

সরো।

কী হল।

সরো বলছি। কাউকে লাগবে না। রাখহরি যা। দুধটা জ্বাল দিয়ে রাখ।

আমাকে যে বাবু ডাকলেন।

বাবুর মাথা খারাপ আছে। ডাকলেও সাড়া দিবি না।

হতাশ সীতেশ খাটে গিয়ে বসে পড়ল।

আরে বসে পড়লে কেন?

আমার মাথা খারাপ।

মাথা খারাপ না হলে মই-এর উপর বউকে তুলে দিয়ে কেউ তার কাজের লোককে ডাকে! মই ধরতে বলে!

চোখ বুজে সিঁড়ি ধরতে জানি না।

ঠিক আছে চোখ খোলা রেখেই ধরবে।

না ধরব না। ঝুলকালি কোথায়। আমি তো কিছু দেখতে পাচ্ছি না। কাউকে লাগবে না তোমার, তুমি একাই মই বেয়ে উঠে যেতে পারো যখন, আমার আর দরকার কী!

লক্ষ্মীসোনা আমার। মই সরে গেলে ধপাস, বোঝো না!

আচ্ছা গ্লাসটা তোমার হাত থেকে ফসকে গেল কেন!

হাত থেকে গ্লাস পড়ে যেতে পারে না! সেদিন তো টেবিলে চা-এর কাপ উল্টে দিলে!

অন্যমনস্ক ছিলাম। খাতা টানতে গিয়ে উল্টে গেল। রাখহরি কখন চা রেখে গেছে মনে ছিল না।

তুমি অন্যমনস্ক ছিলে, আমার বোধহয় তাড়াহুড়োতে পড়ে গেছে। পড়ে যেতেই পারে। এক কথা বারবার শুনতে ভাল লাগে না। কারও যেন হাত থেকে গ্লাস পড়ে যায় না। পৃথিবীর সপ্তম আশ্চর্য। মানুষ বটে তুমি। মই বেয়ে উঠে যাচ্ছি। ধরতে হয় ধরবে, না হয় পড়ে মরব। শক্ত মই হলেই হয় না। শক্ত মই-এরও জোর খুঁটির দরকার। বসে থাকলে চলবে না।

মিঠু আর কথা না বাড়িয়ে সত্যি মই-এর উপর উঠে যেতে থাকল। যে কোনও সময় সরাত করে মই সরে যেতে পারে—দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে। মোমপালিশ করা লাল রঙের মেঝে। আয়নার মতো প্রায়। হেঁটে গেলে প্রতিবিম্ব ভাসে। সে দ্রুত উঠে গিয়ে মই চেপে ধরল। মাথায় পোকা নড়ে উঠলে সামলানো মুশকিল। দু মাসও হয়নি, নতুন রঙ বার্নিস, ডিসটেম্পার দেয়াল, প্লোসেম—এরই মধ্যে ঝুলকালি আসে কোথা থেকে। এলেও তা নিয়ে মিঠুর এতটা বাড়াবাড়ি তাকে কিছুটা যেন অসুস্থ করে দিচ্ছে। দামি

শাড়ির আঁচলে চোখ থেকে ময়লা পরিষ্কারের মতো সন্তর্পণে ঝাড়ের নীচ থেকে হালকা এবং প্রায় অদৃশ্য ময়লাটুকু বের করে নেমে পড়ল। দরজার কাঁচ, জানালার কপাট টুলে উঠে সাফ করতে থাকল।

মাঝেমধ্যেই নীচের গেটে সাইকেলের ক্রিং ক্রিং শব্দ। সদা দু'বার এসেছে। একবার একটা বড় চা-এর প্যাকেট রেখে গেছে। জনার্দনদাকে অর্ডার দেওয়া হয়েছিল—দোকানে তার এত ভাল চা নেই, কলকাতা থেকে আনিয়ে নিয়েছে। একবার সে রেখে গেছে—কিছু ফুল। মিঠুর যেন দম ফেলার সময় নেই। অনবরত উপর নীচ করছে। সিঁড়ি লাফিয়ে এখন উঠে আসছে বোঝা যায়। ঘরে ঢুকতেই দেখল, হাতে দামি ভেলভেটে মোড়া পরিবারের গুরুত্বপূর্ণ অ্যালবামটি।

সীতেশ জানে মিঠুদের পরিবারে সাহিত্যের একটা পরিমণ্ডল একসময় বেশ জাঁকিয়ে বসেছিল। বাবার প্রেস। জেলার সাপ্তাহিক পত্রিকার সম্পাদক, ত্রৈমাসিক পত্রিকাও বের করতেন—প্রেস থাকলে যা হয়।

কলকাতার নামী লেখকরা এই জেলা শহরের অনুষ্ঠানে এলে তিনি তাঁর নিজের বাড়িতে এনে তুলতেন। আদর আপ্যায়ন থেকে দর্শনীয় জায়গাগুলোতে নিয়ে যেতেন। যাঁর যেমন মেজাজ, মেজাজ বুঝে খুশি রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করতেন। দুর্লভ ডাকটিকিটের উপর কিছু ফিচারও লিখেছিলেন। রাজ রাজড়াদের পরিত্যক্ত চিঠিপত্র সের দরে কেনার অভ্যাস ছিল তাঁর। দুর্লভ ডাকটিকিটের সংগ্রহও এইভাবে। বড় কাগজে ফিচার ছাপা হওয়ায় জেলা শহরে কৃতী মানুষ হিসাবে চিহ্নিত হয়ে যান।

যোগাযোগ ছিল সম্পাদকদের সঙ্গে।

একবার তো ত্রৈমাসিক কাগজের একটা গল্প তিনি নিজে না ছেপে, তরুণ লেখকটিকে ডেকে পাঠালেন।

আরে করেছ কী!

কিছুটা স্তম্ভিত মুখে লেখকটিকে দেখছিলেন।

তুমি যাও। চিঠি লিখে দিচ্ছি। অমলের সঙ্গে দেখা করবে। আমার চুনোপুঁটি কাগজ, গল্পটি তোমার ছাপা হবে, তবে যথার্থ মর্যাদা পাবে না।

লেখক কী বলবে বুঝে পাচ্ছিল না। যে কাগজের কথা বলছেন, তাতে লেখা বের করা স্বপ্ন ছাড়া সম্ভব নয়।

তিনি ছিলেন জহুরি।

মিঠুর এই একটা অহঙ্কার থেকেই বোধহয় আজ গুপ্তধনের সামিল অ্যালবামটিও বের করেছে। কিছু পেপার কাটিং-এর ফাইল—যত্ন করে বাঁধানো। স্মৃতির গৌরব আর কী। ফাইল, অ্যালবাম কোথায় রাখবে বুঝতে পারছে না।

অবশ্য এই গৌরব মিঠু করতেই পারে। এই সেদিনও একটি নামী সাহিত্য পত্রিকায় দু'জন প্রতিষ্ঠিত লেখক তার বাবার যশ করেছেন। তাঁর অনুপ্রেরণা এবং সাহায্যের কথা অকুণ্ঠভাবে স্বীকার করেছেন। এই অনুষ্ঠানে যারা আজ আসবে, তারা সব মোটামুটি খবর রাখে, তবে দু-একজন ছাড়া অ্যালবামের ফটোগুলি কারও দেখার সৌভাগ্য হয়নি। অবশ্য তারা সব খবরই রাখে। অনুষ্ঠানে আসার সুযোগে অ্যালবামটি দেখতে চাইতে পারে। তার বাবার লেখাও।

কই দেখি ছোড়দি, বালিকা বয়সে তুমি দেখতে কেমন ছিলে!

বাব্বা বিভূতিভূষণের ফটো। পাশে কে দাঁড়িয়ে?

দেখি।

মিঠু জানে পাশে কে দাঁড়িয়ে। তবু খোলা অ্যালবামটি ঝুঁকে দেখার ভান করবে।

আমার বাবা।

তারপর নিজেই হাঁটু গেড়ে বসে পড়বে।

বাবার যুবক বয়সের ছবির সঙ্গে বিভূতিভূষণের ছবি দিয়ে অ্যালবামটি শুরু।

তারপর নামী-অনামী আরও সব লেখক কবিদের ভিড় আছে এই অ্যালবামে। শেষদিকের কয়েকটা ছবিতে মিঠু নিজেও আছে। বালিকা বয়সের তোলা এই সব ছবির মূল্য তার কাছে অসীম। সাহিত্যের অনুষ্ঠানে সে যেমন যায়, সীতেশও যায়। নিজেরা গরজ করে একটা বার্ষিক সংখ্যাও এবার বের করেছে। এই সংখ্যার উজ্জ্বল মুক্তোটি যে মিঠুই সংগ্রহ করেছে, লেখককে যে সে-ই আবিষ্কার করেছে, শুধু সে নয়, সীতেশেরও বিশেষ দুর্বলতা আছে গল্পটির প্রতি—এই সব সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে কেন যে মনে হল, অ্যালবামটি অনেক দিন তার দেখা হয়নি।

দেখি তোমার অ্যালবামটি।

এখন থাক। কোথায় রাখব ভাবছি।

যেখানে ছিল।

আরে না। বুঝছ না কেন, অত উপর নীচ করতে পারব না। এই ঘরে কোথাও রাখলে হয় না।

শোবার ঘরেই তো থাকার কথা। রাখছ কোথায়। বেশি ঘাঁটাঘাটি করলে নষ্ট হয়ে যাবে। গুপ্তধনের মতো আগলে রেখেছ। কোথায় লুকিয়ে রাখ টেরই পাই না। বলতেও চাও না। পাছে কেউ এলে খুলে দেখাই। পাছে কোনও ছবি তোমার পাচার হয়ে যায়। সেদিন তো দিলেই না। অক্ষয় এল, বেচারা দেখতে চাইল, বললে, কোথায় রেখেছ, খুঁজে পাচ্ছ না।

না পেলে কী করব!

আমাকে বিশ্বাস করতে হবে, কোথায় রেখেছ, তুমি জান না। ঠিকই জানতে, অক্ষয়কে দেখাবে না। ফটো ঘাঁটাঘাটি করলে নষ্ট হয়ে যায়। হাত লাগলে ছাপ পড়তে পারে। অক্ষয় বাউণ্ডুলে স্বভাবের। সে ছবি দেখতে হয় কী করে তাও জানে না। কবিরা একটু বাউণ্ডুলে স্বভাব না হলে মানায় না জান।

যা কবিতা লেখে! কলকাতায় পড়ে থাকলে গুষ্টিবাজি করলে অমন কত কবিতাই ছাপা হয়। কবিতা আমি বুঝি।

গল্পটাও তুমি বোঝ। দরবারি সুখ গল্পটা যাবে কি না দ্বিধা ছিল। তুমি পড়ে বললে, ছাই চাপা আগুন। কাঞ্চন এমন অসাধারণ গল্প লিখবে আশা করতে পারিনি। যার কবিতা পাওয়া দুর্লভ, সে কিনা শেষে তার ছোড়দির কাগজে গল্প দিয়ে গেল! ছাপার পর এখন ভাবছি, না ছাপলে খুব ভুল করতাম। দেখা হলে, কাগজটার কথা কেউ বলছে না। শুধু গল্পটার কথা বলছে। মেজাজ খাপ্পা হয়ে যায়। রাত-দিন খেটে, রাত জেগে তুমি আমি প্রুফ দেখে কাগজ বের করলাম, কাগজটার রুচিবোধের কোনও প্রশংসা নেই, কেবল গল্পের প্রশংসা।

কেন,হিংসে হচ্ছে!

তা এক-আধটু হচ্ছে না বলব কী করে।

হিংসে হলে লোককে কাগজ গছাও কেন। পড়ে দেখবেন, দারুণ গল্প। গল্পটার

তারিফ কে বেশি করছে ! আমি না তুমি !

সীতেশের এই একটা কুস্বভাব আছে। কুস্বভাবই বলা যায়—কোনও কিছু ভাল লেগে গেলে শত মুখে প্রশংসা। এতে নিজেকে যে খাটো করা হয় বুঝতে সময় লাগে। সে নিজেও গল্প লিখেছে—পূর্ণিমার রাতে এক অপ্সরা। কেউ তার গল্পের ধারে-কাছেও ঘেঁষেনি। যেন নিজের কাগজে ছাইপাঁশ সব ছাপা যায়। ছাইপাঁশ ছাপবার জনাই গুচ্ছের টাকা খরচ করে এত আগ্রহ কাগজ প্রকাশ করার।

সে লজ্জার মাথা খেয়ে অন্য আর চার-পাঁচটি গল্পের মতামত জানতে গিয়ে নিজের লেখাটির উল্লেখ করেছে।

মন্দ না। তবে খুব বেশি ইমোশান কাজ করেছে।

ইমোশান কাজ না করলে গল্প হবে কেন ?

শুধু ইমোশান থাকলে গল্প হয় না। কার্যকারণ, পটভূমির বিন্যাস, গদ্যের চাতুর্য অথবা নির্মোহ চরিত্র গঠনই আসল কথা। চরিত্ররা প্রতিষ্ঠা পায়নি। ভিত আলগা আছে।

থাকতেই পারে। তবে সে নিজের দুর্বল গদ্য সম্পর্কে সচেতন। বাড়ির ছাদ এবং ঝিল, পাশে মিঠুর মতো লাবণ্যময়ীর আশ্চর্য ঘ্রাণ, জ্যোৎস্না রাত এবং নারীর সুঘ্রাণ সব মিলে মিশে গল্পের কাঠামো তৈরি করেছে। বোঝা যায়, সে এবং তার স্ত্রী মিলে কোনও পূর্ণিমা রাতের ছবি হয়ে আছে গল্পে। বড় বেশি ব্যক্তিগত—ব্যক্তিগত হলেও ক্ষতি নেই—যদি তার অনুভূতিমালা আরও গাঢ় হত—সেটাই তার নেই।

জ্যোৎস্নারাত আর ছাদের নিরবধি একাকিত্ব—ঝিলের নীরব আত্মপ্রকাশ আকাশে-বাতাসে এবং নক্ষত্রমালায় তার প্রতিবিম্ব কত না আশ্চর্য অনুভূতি দিয়ে গড়ে তুলতে চেয়েছিল তার প্রিয় নারীকে। হয়নি। তার তখন কষ্ট হয়।

মিঠু বলেছিল, যে যাই বলুক, আমার কিন্তু ভাল লেগেছে।

তোমার ভাল লাগলে খুশি হওয়া যায়। কিন্তু তৃপ্তি পাওয়া যায় না।

তা লোকের কথা ধরেই বসে থাক। আমার মতামত তবে নাও কেন ?

সকাল থেকেই মেজাজ গরম। তোমার মতামতকে আমি দাম দিই না বলছ ! কিরণদাকে তবে কে গিয়ে বলেছে, এবারের আসর আমাদের বাড়িতে করতে চায় মিঠু। তুমি তো জান কিরণদার পছন্দ নয় অন্য কোথাও অনুষ্ঠান হোক। নিজের বাড়িটা তিনি আমাদের জন্য ছেড়েই দেন। এতে তাঁর আনন্দ আছে। ব্যাচেলার মানুষ, লোকজন ভালবাসেন। বললেন, মিঠুর ইচ্ছে !

হ্যাঁ খুব ইচ্ছে।

তা হলে আর কী করা ! লেডিজ ফার্স্ট। দ্যাখ কোনও যেন ত্রুটি না থাকে। কাঞ্চন জানতে পারলে খুবই খুশি হবে।

মিঠু কপট চোখে সীতেশকে দেখল। সামান্য কপাল কুঁচকে বলল, কাজেকর্মে ত্রুটি থাকেই। কিরণদারও থাকে। সাহিত্যপাগল মানুষ, বুঝি। পাঁচটায় অনুষ্ঠান শুরু। ছটা সাড়ে ছটা বেজে যায়। শেষে তোমরা যা কর ! ছাইপাশ গেলা। এত গিললে কি আর হুঁশ থাকে। যে যা পড়ে হাব্বা হাব্বা বলে চিৎকার করতে থাকো।

যেন ত্রুটি না থাকে।

ত্রুটি কী নিয়ে থাকতে পারে মিঠু ভালই জানে। ভাল জানে বলেই দুটো বড় এনে রেখেছে। সবাই খায় না। তবে কেউ কেউ খায়। আসর জমে যায়। যে যার মতো পাশের ঘরটায় ঢুকে খেয়ে আসে। ঝিম মেরে থাকে কেউ। কবিতার দু-একটা লাইন

মাতাল করে দেয়। পুনরাবৃত্তি লাইনের। গানেরও কণ্ঠ শোনা যায়। দু-এক লাইন কেউ গেয়ে ওঠে, গোলাপ ফুল ফুটিয়ে আছে।

এ-জন্য সে-ও নীচে ব্যবস্থা রেখেছে। বাবা তার খুব আমুদে মানুষ ছিলেন—বাবার ঘরটাতেই সে ব্যবস্থা রেখেছে। খাট এবং বসার সব ব্যবস্থা, এমনকি আইস কিউব, সোডা—কোনও কিছুরই ত্রুটি সে রাখেনি।

এক-আধটু খেলে মেজাজ শরিফ থাকে সেও বোঝে। সেও গেলাসে ক্যাম্পাকোলার সঙ্গে কিছুটা গোপনে মিশিয়ে নেয়। কিরণদা লুকিয়ে তাকে দেয়।

তোমরা খাচ্ছ।

খাবে।

না থাক।

আরে খাও না। এই সীতেশ মিঠু কী বলছে শোনো! খাবে না বলছে। মেজাজ শরিফ সীতেশের।

তুমি না খেলে আমি মরে যাব মিঠু। আর যাই কর কিরণদাকে অপমান করতে পার না। আমরা পারি না, তুমিও পার না। মাই সুইট সিক্সটিন—দিল মেরা আনজান—

এই মুশকিল কিরণদা। লিমিট রাখতে জানে না। কী করছে দেখুন!

সীতেশ, নো মাতলামি। খাবে। আমি বলছি খাবে। আমার তোমার অনারেই খাবে।

একটু।

বেশি দিচ্ছি না। দ্যাখই না। এই একটু। দারুণ মজা পাবে।

না, না, আর না। অত খেতে পারব না।

আরে এতে তো একটা মাছিও ডুববে না।

এই যথেষ্ট।

এই করেই শুরু পটটির। তার প্রেজুডিস নেই। তবে পাড়ায় থাকে। সীতেশকে নিয়ে ফিরতে হয়। তার বাবার আমল থেকেই বাড়িটার বিশেষ সুনাম নেই। বাবাও তার মেজাজি মানুষ—মানুষের বড় দরকার সঞ্জীবনী সুধার। সীতেশ মাঝে মাঝে লিমিট ছাড়িয়ে গেলে সে অশান্তিও করে। এই পর্যন্ত।

লোকে কী ভাবে বল তো!

গুলি মারো। আমার খুশি আমি খাব। কারও বাপের টাকায় খাচ্ছি না। দারুণ মজা। বলেই গুন গুন করে গান—এক মায়াবতী মেঘে এল তন্দ্রা...

মিঠুর তখন রাগ থাকে না। সীতেশ নেশা করলে বড় সুন্দর গায়—দরাজ গলায়—সঙ্গে সে-ও গায়—এবং জানালায় পর্দা ওড়ে। কী যেন নেই, ছিল না, সামান্য ছলনা এবং এই এক মায়াবতী মেঘে এল তন্দ্রা—মায়াবতী মেঘ যেন মিঠু নিজে।

মিঠুকে জড়িয়ে বলত, ও আমার মায়াবতী মেঘ।

ওঃ ছাড়ো।

তোমার চোখে আমার মায়াবতী মেঘ ভেসে যাচ্ছে।

যাও, হাত মুখ ধোও। কিছু খাবে?

না। কিচ্ছু খাব না। আমি ভেসে যাব।

বেশ যত খুশি ভেসে যাবে। আগে হাত মুখ ধুয়ে ফ্রেস হয়ে নাও। তারপর দেখা যাবে।

আসলে এইসব জীবনেই থেকে যায় কোনও গূঢ় এক ইচ্ছের তাড়না। কোথায় যে অসীম অনন্তে লুকোবার প্রগাঢ় বোধ প্রচ্ছন্ন থাকে কেউ জানে না। হাত থেকে গ্লাসটা কেন যে পড়ে গেল। অন্যমনস্ক। কেন!

সীতেশ, সীতেশ! সীতেশ আছ!

ধড়ফড় করে উঠে বসল সীতেশ। মিঠু নীচে। কিরণদা নিজে এসেছেন সব ঠিকঠাক আছে কি না খবর নেবার জন্য।

কিরণদা ঢুকেই বললেন, দারুণ। আমাদের ঘরটা একবার দেখাও।

মিঠু তার বাবার ঘরে নিয়ে গেল। লকার থেকে বোতল দুটি বের করে দেখাল। তার পছন্দ মতোই মিঠু ঘরে দুটো রেখেছে।

আরে কোথা থেকে জোগাড় করলে! দুষ্প্রাপ্য। মিঠু তুমি নিজেই তোমার তুলনা। ব্ল্যাক লেবেল। আরে সীতেশ, ওই চোরটা কোথায়—কোথায় লুকিয়ে আছে! ওকে দেখছি না! সাড়া নেই।

মিঠু কী করেছে!

মিঠু বলল, ত্রুটি থাকবে না কথা দিয়েছিলাম। খুশি?

আমিও ত্রুটি রাখিনি। কাঞ্চন আসবে বলেছে।

সীতেশ চাদর গায়ে দিয়ে নীচে নেমে দেখল, কিরণদা প্রায় বুকে জড়িয়ে ধরেছেন, অসামান্য বস্তুদুটিকে। তাকে দেখে বললেন, ওতে কি কুলাবে!

না কুলালে, নিয়ে আসব।

কিন্তু মিঠু এত বড় সারপ্রাইজ দেবে, না, ভাবা যায় না।

কিরণদা বালকের মতো খুশি।—কাঞ্চন প্রায়ই আসে তোমার বাড়িতে এবারে বোধহয় রাজার মতো আসবে।

শোনো, ওই তোমার সমরবাবুরা যত তাড়াতাড়ি বিদেয় হয় ততই ভাল। বুড়োহাবড়াদের আমি একদম পছন্দ করি না। তুমি তাদের বলতে বলেছ, তাই বলে এসেছি। আমি কিন্তু ভিতরে থাকব না। নম নম করে ওদের বিদেয় করে দেবে।

সীতেশ মিঠু দু'জনেই কিরণদাকে পছন্দ করে। দিলখোলা মানুষ। পি ডবলু ডি-র বড়বাবু। খোলা মনেই বলেছেন, দ্যাখ আমার কাজে দু পয়সা ব্যাজ আছে। সৎ কাজে তা খরচ করতে পারলে পাপ থাকে না। অকারণে তোমরা এতটা খরচের ধাক্কায় না গেলেই পারতে।

মিঠু সযত্নে ও দুটো তুলে রাখার সময় বলল, 'কাঞ্চন কি তোমার বাড়ি হয়ে আসবে, না সোজা চলে আসবে।

এলেই হল। যা পিতপিতে স্বভাব, এসেই তো বলবে, দ্যাখ তো দাদা, কপালে হাত দিয়ে দ্যাখ, গাটা কেমন ছ্যাঁক ছ্যাঁক করছে।

মাথা ধরা না থাকলেই বাঁচি।

কিঞ্চিৎ রুষ্ট গলা মিঠুর।

কেন যে এত মাথা ধরে। গা ম্যাজ ম্যাজ করে, সর্দি-কাশির ধাত,বুঝি না। ওষুধের ডিপো।

ছোড়দি একগ্লাস জল।

জল দিলে ঢাকনা সরিয়ে জল জরিপ। গ্লাস উঁচু করে দেখা, তারপর পকেটে হাত। দুর্লভ ট্যাবলেট আলতো করে জিভের নীচে,তারপর এক ঢোক জল। মিঠুর তখন কেন

যে ইচ্ছে হয় গ্লাসটা ছুড়ে মারে।

ওকে বলেছ তো গল্প পড়তে হবে ? কবিখ্যাতি না মাথা বিগড়ে দেয়। গল্প আনতে ভুলে যায়।

বলেছি। তবে গাঁইগুঁই করেছে। মাথায় কিছু নেই। পারছি না। কালি শুকিয়ে গেছে। কত বাজে অছিলা, মেজাজ ঠিক থাকে না। বলেছি ছোড়দির অর্ডার। সঙ্গে গল্প না নিয়ে গেলে তোমার আর মুখ দর্শন করবে না ছোড়দি। পরীক্ষার বাহানা তো আছেই। সামনে পরীক্ষা।

পরীক্ষা তো বাবুর লেগেই আছে। পরীক্ষার কি তার আর শেষ আছে। ওটা আছে বলেই বেঁচে আছেন। টেনশান। টেনশান না থাকলে বেঁচে থাকার মানে খুঁজে পান না তিনি। পরীক্ষার আগে হয় হাত পা অবশ হয়ে আসবে, না হয় মাথা ঘুরবে। দিলেও গাড্ডু মারবে। হল না। মা কত আশা করে থাকে, বার বার পরীক্ষায় বসতেও তার ভাল লাগে না।

কবার হল ! মনে তো হয় অসংখ্যবার।

তা কী করে জানব। কিছু বললেই এক কথা, জান তো, মা আমার মাঝে মাঝে স্বপ্ন পর্যন্ত দেখেন, আমি বি এ পাশ করেছি। কিন্তু পারছি না। আমার কিচ্ছু হবে না জান !

হবে না তো দিচ্ছে কেন ? কাজকামের চেষ্টা করুক।

মা যে কিছুতেই রাজি না। খোকা তোর বাবার কত আশা ছিল, তুই তার মনস্কামনা পূর্ণ করবি না ! মরেও তোর বাবা শান্তি পাচ্ছেন না। আত্মার সদগতি বলে কথা। এমন বললে কার না রাগ হয় বল কিরণদা। কথা বলতে ইচ্ছে হয় না। এমন ব্যাজার মুখে তাকিয়ে থাকে, কথা না বলেও পারি না। খারাপ লাগে।

নীচে একে একে লেখক কবিরা জমায়েত হচ্ছে।

কোথা থেকে।

আতাপুর থেকে আসছি।

আসুন। ছোড়দি আতাপুর থেকে একজন কবি এসেছেন।

আপনার নামটা কী ?

মাধব চক্রবর্তী

লিখে নাও মাধব চক্রবর্তী।

কী পড়বেন !

দুটো কবিতা।

দুটো হবে না। সময় কম। একটা পড়বেন।

কতদূর থেকে এসেছি। একটাতে পোষাবে না।

ছোড়দি একটাতে পোষাবে না বলছে।

ছোড়দি উপরে, অক্ষয় নীচে। সে-ই আপ্যায়নের ভার পেয়েছে। কিরণদা হয়তো এক্ষুনি এসে পড়বেন। ধুতি পাঞ্জাবি আর আতরের গন্ধে সারা বাড়িটা ভরে যাবে। কিরণদা এলেই টের পাবে ছোড়দি। সীতেশও। মাথায় কালো টুপি পরে কে একজন এল ! রিকশা থেকে নামার সময় বলল, এটা কি সীতেশ করের বাড়ি ?

আজ্ঞে হ্যাঁ। আসুন।

মিঠু ওপরে। রাগে ফুঁসছে। কিরণদার কাণ্ড। সাপ্তাহিক গণরাজ পত্রিকায় কেন যে বিজ্ঞাপন, গল্প, কবিতা পাঠের আসর, ২৭ ফাল্গুন— মতিঝিলে সীতেশ করের বাড়ি।

বিজ্ঞাপনটাই কাল হল।

এতবার বলেছি, কী দরকার। না, বাবুর ইচ্ছে, যখন ইচ্ছেই ভালভাবেই হোক। কিরণদারও ইচ্ছে সীতেশ করের বাড়ি, শত হলেও, জামাই বাবাজি জগদীশ বাবুর। তারই মেজাজ পেয়েছে। মিঠু বাবার গুণগুলিকে সম্মান দিতে জানে। সাড়ে সাত কেজির তোল্লাই। এই তোল্লাই-এর ফাঁপড়ে পড়ে সেও রাজি হয়ে গেছে। রাগে ফুঁসছে ঠিক, তবে সেও দায়ী। তার অমতে কাজটি হয়নি, বিজ্ঞাপনটি এখন বাঁশ হয়ে যাচ্ছে—আতাপুর নাম শুনেই মেজাজ গরম। ময়লা শার্ট, গলায় মাফলার, বগলে ব্যাগ, কেডস জুতো পরে মাধব চক্রবর্তী হাজির।

তারপর যা হয়, আসছে। তার পরিচিতরাও এসেছে। সুতার হাটের কবি সম্মেলনের পরিচিতরাও এসে গেছে। নীচে উপরে লোক গিজগিজ করছে। সমরদা কমলদা আসতেই কিরণদা হাত জোড় করে এগিয়ে গেল। উপরে তুলে নিয়ে গেল। সাইকেল জমে গেল নীচের উঠোনে। মিঠু বার বার ব্যালকনিতে ক্রিং ক্রিং শব্দ শুনলেই ছুটে গেছে। উৎকণ্ঠা। রোগাভোগা মানুষটির পাত্তা নেই।

কিরণদা!

যাই।

ও তো এল না!

আসবে। আসার সময় যায়নি।

ধূপকাঠি জ্বালিয়ে দেওয়া হল। সভাপতির গলায় মালা পরানো হল। অপর্ণাদি তার বড় মেয়েটিকে এ জন্য বরাদ্দ করে রেখেছে। শুধু এখানেই নয়, সভা সমিতিতে মেয়েটিকে নিয়ে তিনি যান, কবি অকবি সবার গলায় মালা পরাতে। নিজেই ছবি তোলেন, এবং যত্ন করে অ্যালবামে সাজিয়ে রাখেন। যার যেমন গৌরবের অধিকার—তারপর হারমোনিয়াম বাজিয়ে গান—অপর্ণাদির গলা—তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা। মেয়ে কবি অকবির গলায় মালা পরায়, মা হারমোনিয়াম বাজিয়ে গান গায়। যে যেমন ধ্রুবতারা খোঁজে।

ও তা হলে এল না।

কিরণদা বললেন, বেইমান।

সীতেশ বলল, কার জন্য করি।

মিঠুর কিছু ভাল লাগছে না। সব অর্থহীন মনে হচ্ছে। হাত থেকে গ্লাসটি ফসকে গেছে। অমঙ্গলের শুরু।

অক্ষয়, সদা, মৃণাল সব ভার নিয়ে নিয়েছে। মিঠু ছাদে উঠে একা দাঁড়িয়েছিল। বাড়িটা হালকা হয়ে আসছে। যে এলে, গল্প পড়লে তার সম্মান থাকত, সে-ই এল না। তখনই সীতেশ উপরে উঠে এসে বলল, তুমি এখানে। নাও। কিরণদা খুঁজছিল। আমাকে দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছে। ওটাকে এমন পেটাব না, বুঝবে। খাও। তুমি না খেলে সব উৎসব মাটি। গ্লাসটা পড়ে গেল কেন নিশ্চয় বুঝতে পারছ। এবারে খেয়ে যত পারো জ্বালা মেটাও। ফুর্তি কর। না না ফুঁপিয়ে কান্না নয়। আনন্দ। শুধু আনন্দ।

॥ ৩ ॥

বিশ্রী একটা স্বপ্ন দেখে ঘুম ভেঙে গেল লীলার।

জল তেষ্টা পাচ্ছে। যেন বুকে কেউ চেপে বসেছিল। একটা বিশাল উটের মুখ, তবে মানুষের মতো হাত পা। গলা টিপে ধরেছিল যেন।

গলা টিপে ধরেছে, না তাকে কব্জা করতে চাইছে—তারপর উটের মুখটা লাফিয়ে নেমে গেল। দেয়ালের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল।

সে আতঙ্কে চোখ মেলে তাকাতে পারছে না। যেন চোখ খুললেই দেখতে পাবে দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

পুরো স্বপ্নটা সে এখন মনে করতেও পারছে না। আধো ঘুম আধো জাগরণের অবস্থা তার। তার এমনিতে ঘুম ভাল হয় না। শ্বাসকষ্ট থাকলে ঘুমের ব্যাঘাত হবেই। তবে আজ শ্বাসকষ্ট ছিল না। রাতে শোবার সময় সে দু পিস পাউরুটি এক কাপ দুধ খেয়েছে। রাতে হাল্কা খেলে শ্বাসকষ্ট প্রায় থাকেই না। তবু যেন মনে হচ্ছিল বুকটা ভারী, কেউ কিছু ভার চাপিয়ে দিয়েছে বুকে। কিন্তু তার আগেও একটা স্বপ্ন দেখেছে।

ধীরে ধীরে মনে পড়ছে তার।

কেউ যেন জলে ডুবে যাচ্ছিল। জল থেকে তুলে দেখা গেল, খোকার বাবা শুয়ে আছে। কতদিন পর খোকার বাবাকে স্বপ্ন দেখে তার মন ভারী হয়ে উঠেছিল। খোকার বাবা তার দিকে চোখ মেলে তাকাতেই যেন কালো বেড়ালের উপদ্রব। তার আগে একটা স্বপ্ন ছিল— পর পর সব মনে পড়ছে। একটা কাকাতুয়া উড়ে যাচ্ছে। খোকা কাকাতুয়াটাকে ধরার জন্য পাগলের মতো ছুটছে রেল-লাইন ধরে— আর তখনই কোনও মালগাড়ির শব্দ। দূরে অনেক দূরে, মালগাড়ির আলো—খোকাকে আর দেখা গেল না।

উটের মুখ, কালো বেড়াল, খোকার বাবার মুখ, কাকাতুয়া একসঙ্গে স্বপ্নে থাকলে কী হয় জানে না। স্বপ্ন দেখার কোনও অর্থ থাকে! কোনও আগাম নোটিস— মনটা লীলার খারাপ হয়ে গেল।

তারপরই যা মনে হল, সে আরও কঠিন দৃশ্য। মালগাড়িটা চলে গেলে দেখতে পেল, খোকা লাইনের ধারে পড়ে আছে। স্বপ্নে রেলগাড়ি দেখলে কী হয় সে জানে না। হেরম্বকে বললে কী করতে হবে না হবে বলে দিতে পারে। মানুষটা যত বাজেই হোক অনেক কিছু জানে। কোন স্বপ্নে কী ফল হয় সে জানে। গুপ্তবিদ্যার অধিকারী। জানতেই পারে। কিন্তু খোকা বাড়ি থাকলে মুশকিল। সে পছন্দ করে না— হেরম্বকে ডেকে কিছু জানতে চাইলেই, সে চিৎকার করে বলবে, আবার তুমি কী আরম্ভ করলে মা। খেয়েদেয়ে কি তোমাদের আর কাজ নেই। হেরম্ব সাধু না ছাই, সাধু কখনও বউকে পেটায়! লীলা একবার না থাকতে পেরে ছুটে গিয়েছিল, কী আরম্ভ করলেন আপনারা! আপনি কি মানুষ! মালিনীকে পেটাচ্ছেন!

হেরম্ব জিভ কটে বলেছিল, ছিঃ ছিঃ কী যে বলেন। মালিনীকে আমি পেটাতে পারি! আজ্ঞে আমি তো আদ্যা স্তোত্রম পাঠ করছিলাম। অপত্রো লভতে পুত্রং—পুত্র লাভের আশায় করি। নারী হল গে পাতালে বৈষ্ণবীরূপা মর্ত্যে করালবদনা। মোহিনী মায়ায় আক্রান্ত হই দিদি। আমি সাধু মানুষ, পেটাব কাকে!

সুতরাং হেরম্ব তার বউকে পেটায় না। আদ্যা স্তোত্রম পাঠ করে। কী যে বলবে! একবার না পেরে খোকার বাবা তেড়ে গিয়েছিল।

তখন চোখ জবাফুলের মতো হেরম্ব সাধুর। ভর্ৎসনা! কী বললেন, আমি অমানুষ। জানেন আমি কী করতে পারি। সব ভস্ম করে দিতে পারি। তারপরই প্রার্থনা করার মতো সূর্যের দিকে মুখ তুলে বলেছিল, চক্রিনী জয়দাত্রী চ রণমত্তা রণপ্রিয়া—হে দেবি দুর্গা আপনার বরলাভে আমি এখন ক্রোধী। অবচীনকে রক্ষা করুন।

তারপর খোকার বাবার দিকে কাতর চোখে তাকিয়েছিল—বলেছিল, আপনি যান।

বাকসিদ্ধ মানুষকে চটাতে নেই—কী বলতে কী বলে ফেলব, আপনাকে অভিশাপ দিতে পারি না। খোকার অমঙ্গল হবে। লীলাদি কষ্ট পাবেন। তবে কিছু তো ক্ষতি হবেই। ক্রোধের প্রতিক্রিয়া, কী আর করা।

লীলা মনে করে, এ-জন্যই তার শ্বাসকষ্ট। এ-জন্যই ছেলেটা তার রোগাভোগা। খোকার সামনে কিছু বলাও যাবে না। খোকা বিরক্ত হবে। লোকটা অতি চতুর, অনায়াসে মানুষের আত্মবিশ্বাসে বরফ চাপা দিতে পারে। লোকটার এই এক অদ্ভুত ক্ষমতা।

রাস্তাঘাটে চায়ের দোকানে এমনকি বাড়িতেও যখন তখন শোনা যাবে— এই যে হেরম্ব সাধু খুবই বিপাকে পড়া গেল হে! মাঝে মাঝে ডানচোখের উপরটা নাচছে। আপদ বিপদের গন্ধ পাচ্ছি।

কোথায় বললেন ? ললাটে।

হেরম্ব সামান্য কানে খাটো। সে ভাল শুনতে পায় না। সত্য চট্টরাজ তাকে কিছু বলছেন। এই সময় মানুষটা সড়ক ধরে জমি জিরাত দেখতে বের হয়েছেন। হেরম্বকে ডাকতেই ছুটে গেছে সে। জোতদার মানুষ। সংসারে পোষ্য অনেক। সময়ে অসময়ে হেরম্বকে ডেকেও পাঠান। হেরম্বর বিধান মতো কাজ করে ফলও পেয়েছেন।

গাঁয়ের মোড়ল মানুষ সত্য চট্টরাজই একদিন সবাইকে ডেকে বলেছিলেন হেরম্বকে চটিও না। ও গুপ্তবিদ্যার অধিকারী। অনায়াসে সে মানুষের ভালও করতে পারে, ক্ষতিও করতে পারে।

এ-সব কথা চাউর হয়ে যায়। মালিনীকে পেটালেও আর কারও সাহস হয় না— খোকার বাবা বেঁচে থাকতে ঝামেলা পাকাত— কে জানে, হেরম্বর গুপ্তবিদ্যাই শেষপর্যন্ত শেষ করে দিল কি না মানুষটাকে।

মনটা খুবই খচখচ করছে।

নানা প্রশ্ন।

মালগাড়ি দেখলে কী হয় ?

উটের মুখ দেখলে কী হয় ?

কাকাতুয়া দেখলে কী হয় !

খোকা বাড়ি থাকলে হবে না। ভুজুং ভাজুং দিয়ে লোকটা মানুষকে বশ করে ফেলে, খোকার এই এক অভিযোগ। স্বপ্ন বিজ্ঞান নাকি হেরম্বর খুবই ভাল জানা, লোকে বলে।

মালিনী তো একদিন কেঁদে বলেই ফেলল, দিদি, মানুষটার কাছে আমার ঋণের শেষ নেই। মেজাজ বিগড়ে গেলে মারে। সন্দেহবাতিক— পুরুষের সঙ্গে কথা বলতে দেখলেই মাথা গরম। আমার হয়েছে মরণ। করি নার্সের কাজ, আমার কি উপায় আছে! মারলেও কিছু আমি মনে করি না।

তা ডাক্তারবাবুরা আছেন। জটিল কেস হলে লেবার রুমেও তাঁরা থাকেন। কথা না বলে উপায় কী। কাজটা ছেড়ে দিলে কী খাবে এই দুশ্চিন্তাও কম না। মেয়েটাও বড় হয়ে উঠেছে, গাঁয়ের হাইস্কুলে যায়— মাধ্যমিক পাশ করলেই বর খোঁজা হবে। তবে হেরম্ব যা মানুষ, মানুষ পটাতে ওস্তাদ। মেয়ের বিয়ে নিয়ে মালিনীর বিন্দুমাত্র দুশ্চিন্তা নেই। মেয়েটা একটু বাপ-সোহাগি—দেখতেও ভাল—কে একবার একটা চিঠিও দিয়েছিল, বইয়ের মধ্যে গুঁজে— তা সোমত্ত মেয়ে, একই সঙ্গে ছেলেমেয়েরা পড়ে— গাঁয়ের ইস্কুল—বয়সের গাছ পাথর থাকে না। নলিনীর টেনে পড়ার বয়স পাঁচ সাত বছর

আগেই পার হয়ে গেছে।

চিঠিটা মালিনী, লীলাকে দেখিয়েছিল। শুধু লেখা—চিলি চিকেন, তোমাকে আমি খাব। নীচে লেখা বটবৃক্ষ।

সাংকেতিক নাম। নলিনীর কাছ থেকে কিছুই উদ্ধার করা যায়নি। মেয়েদের বয়স হলে লজ্জা হয়, নলিনীকে দেখলে তা মনে করার কারণ থাকে না।

কে চিঠি দিল ?

কী করে বলব !

বটবৃক্ষ কে ?

জানব কী করে ! চিলি চিকেনের মতো খাবে বললে, আমি কী করব। চিলি চিকেন কি তাই জানি না। যদি খায়, খাবে।

খোকা তুই জানিস ? চিলি চিকেন কী ?

না মা। তবে মুরগির মাংস ঝাল মশলা হবে হয়তো।

নির্ঘাত শহুরে ছেলের কাজ।

হেরম্ব বলেছিল, বোঝলেন না কুটকুটি উঠেছে। মন্দ না। কুটকুটি না থাকলে মেয়ে বড় হচ্ছে বুঝব কী করে !

হেরম্বর মুখের আগল নেই। মেয়ের সম্পর্কে অশ্লীল কটূক্তি অবলীলায় করে যেতে পারে। কুটকুটি কথাটা কত কুৎসিত শোনায় হেরম্বর বোধহয় সেই বোধই নেই। তার কাছে যাওয়াও খুব নিরাপদ নয়— তবে পাশাপাশি একই ছাদের নীচে দুটো কোয়ার্টার। মাঝখানে উঁচু পাঁচিল, পেছনে রান্নাঘর। কান পেতে রাখলে সবই শোনা যায়। স্বপ্ন সম্পর্কে কুরুচিকর অপব্যাখ্যা যে করবে না কে জানে।

সকালে ঘুম থেকে উঠে লীলার মন ভাল না। রাতে স্বপ্নটা দেখার পর একবার খোকার জানালায় উঁকি দিয়ে দেখেছে। খোকা শিশুর মতো ঘুমিয়ে আছে। সকালের রোদ এসে জানালায় পড়েছে। শেষরাতের দিকে ঠাণ্ডা পড়ে। চাদর জড়িয়ে বালিশে মুখ ঢেকে শুয়ে আছে। কিছুতেই বালিশ মাথায় রাখে না। বকা ঝকা করেও কোনও কাজ হয়নি। বালিশটা দিয়ে মুখ ঢেকে রাখে। কোনও আলোই যেন তার সহ্য হয় না। বড় মায়া ধরে যায়।

লীলা তুলসীতলায় প্রণাম করার সময় পুত্রের মঙ্গল কামনা শেষে গাছকে স্বপ্নের কথা বলল। গাছ কিংবা নদীর কাছে স্বপ্নের কথা বললে ফলে না। খোকা কেন যে লাইনের ধারে পড়ে আছে দেখতে পেল বুঝতে পারছে না। খোকাকে না ডাকলে ঘুম থেকে উঠতেই চায় না। সারা শরীরে তার এত আলস্য যে, ঘুম থেকে উঠেও বার বার হাই তোলে। চা এর কাপ সামনে, দুটো বিস্কুট। সে ভেঙে ভেঙে পাখির আহারের মতো খায়।

একবার হেরম্বকে এই সুযোগে খোঁজ করলে হয়।

পূজন উঠে দেখছে, দিদি কখন ঘুম থেকে উঠে গেছে। এ-বাড়িতে সবার আগে পূজন ওঠে। এদের বোনেদের ধাত রোগাটে। পূজনেরও অত্যন্ত পলকা শরীর। পলকা শরীর বলেই যেন এত কাজ এক হাতে সামলাতে পারে। পাখির মতো উড়ে উড়ে কাজ করে।

ঘুম থেকে উঠে দিদিকে দেখল বাথরুম থেকে বের হচ্ছে চোখে মুখে জল দিয়ে।

পূজন কিছুটা অবাকই হল। কাল রাতে দিদির তবে ভাল ঘুম হয়েছে। ভাল ঘুম হলে শরীর ঝরঝরে থাকে। খুব সকালেই ঘুম ভেঙে যায়। দিদি তখন তার কাজে উঠে পড়ে

লাগে। বাসি কাপড় পাল্টে লীলা বলল, মালিনীর ঘরে যাচ্ছি। চাটা ওখানে দিয়ে আসিস।

পাখির মতো উড়ে উড়ে কাজ করে ভাবনাটাই যে কাকাতুয়ার স্বপ্ন এমনও ভাবল। খোকাকে নিয়ে খুবই দুশ্চিন্তায় থাকে—কাল কলেজ হয়ে সীতেশের ওখানে যাবার কথা, রাত হবে ফিরতে, কিন্তু কী হল কে জানে, খেয়ে দেয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ল। কলেজেও গেল না, সীতেশের বাড়িতেও না।

বেলায় উঠলে বলেছিল, কী রে গেলি না।

শরীরটা ভাল নেই মা। তারপর গায়ে চাদর জড়িয়ে রেললাইনের দিকে হেঁটে গেছে। ফিরতে বেশ রাত হয়েছিল। লীলার অকারণ কিছু দুশ্চিন্তার বাই আছে। ছেলে গেছে, ফিরবে। ওদিকটায় শালের জঙ্গল আর মাঝ মাঝে রেলের ইঞ্জিনের ধোঁয়া ছাড়া ভয়েরও কিছু নেই। ধুলো ধোঁয়া খোকার সহ্য হয় না। সর্দির ধাত—কী জানি,যা অন্যমনস্ক,কখন কী ঘটে যায়। অন্যমনস্ক হয়ে পড়লে হুঁশও থাকে না। জঙ্গলে পোকামাকড়ের উপদ্রব আছে। রাতে ফিরলে পোকা মাকড়ের গায়ে পা পড়তে পারে। একবার পূজনকে বলেছিল, তুই যা পূজন, একটু এগিয়ে দ্যাখ। শিয়রের নীচে টর্চটা আছে। সঙ্গে নিয়ে যাস।

আসলে আতঙ্ক। পূজন দরজা খুলে বের হয়ে বেশি দূরও যায়নি। হাসপাতালের কাঁটাতারের বেড়ার কাছে যেতেই দেখেছিল, রেলের নালা পার হয়ে কেউ এদিকে আসছে। জ্যোৎস্নায় স্পষ্ট নয়, তবু এত চেনা যে, খোকা ছাড়া আর কেউ নয় সে ঠিক ধরে ফেলেছে।

তার তো কপাল ভাল না। এমন জোয়ান মানুষটা রোগ ভোগ নেই ধপাস করে পড়ে গেল। মরেও গেল। সে একটুকুতেই বিচলিত হয়ে পড়ে। শহরে গেলেও তার চিন্তা। কখন ফিরবে সেই আশায় বসে থাকে। মাঝে মাঝে ফেরেও না। বন্ধু বান্ধবদের বাড়ি থেকে যায়। কিরণই বলে গেছে, মাসিমা চিন্তা করবেন না। ও না ফিরলে বুঝে নেবেন, আমাদের কারও বাড়িতে আছে।

তবে খোকা রাতে ফিরতে না পারলে বলে যায়। মাকে সে কোনও কারণেই কষ্ট দিতে চায় না। মাকে উদ্বেগের মধ্যে রাখতে চায় না। সে জানে তার মা সামান্য টেনশানেই অসুস্থ হয়ে পড়ে। অসুখটা এত বিশ্রী যে খোকা কখনও তাকে আঘাত দিয়ে কথা বলে না। না ফিরতে পারলে বলে যায়, এক দু-দিন, হপ্তাহও হয়ে যায়, কোথায় কোথায় খোকাকে নিয়ে কিরণদের যে উৎসব শুরু হয়ে যায়— সামান্য চিরকুটে কিরণ লোক পাঠিয়ে জানিয়ে দেয়, মাসিমা আমরা কুমারগঞ্জ যাব। খোকা আমাদের সঙ্গে যাবে। খোকাও হাত চিঠি দেয়, মা, কিরণদা ছোড়দি সীতেশদা আটকে দিল। আমি না গেলে ওদের যাওয়ার নাকি কোনও অর্থ হয় না। তুমি আমার জন্য চিন্তা কোরো না। মনে করে লক্ষ্মী মা আমার ওষুধটি অন্তত খাবে।

আসলে রেললাইনের একটা উদ্বেগ ছিল। স্বপ্নে রেললাইন, দেখতেই পারে। রেললাইনের এপারে কিছু নালা ডোবা আছে। ডোবার জলে খোকা একবার ডুবে গিয়েছিল— এখনও সাঁতার জানে না, ডোবা পার হয়ে আসতে হবে ভাবলেই অস্বস্তি থাকে। জলে ডোবা মানুষের স্বপ্নটারও না হয় অর্থ হয়। কিন্তু উটের মুখ কিংবা কাকাতুয়ার কথা তো সে কখনও ভাবে না।

মালিনী আছিস ! মালিনী !

ও মা লীলাদি ! সাত সকালে ! কী মনে করে !

মালিনী অবাকই হয়ে গেছে। লীলাদি তার কোয়ার্টার ছেড়ে কোথাও যায় না। ডাক্তারবাবুদের কোয়ার্টারে লীলাদিকে দেখাই যায় না। লীলাদির মধ্যে চাপা আভিজাত্য আছে সে বোঝে। কিছুটা অহঙ্কার— কী নিয়ে অহঙ্কার বুঝতে পারে না। কারও সঙ্গে বিশেষ মেশে না। কারও নিন্দামন্দে থাকে না। ছেলেকে নিয়েই ব্যস্ত। নিজের অসুখটার জন্যও ভাবনা নেই। কেমন তরল এক অতি সাময়িক ঘটনায় নিজের মধ্যে সব সময় ডুবে থাকে। সাত সকালে তাকে দরজায় দেখলে বিস্মিত হতেই হয়।

হেরম্ব আছে !

এই তো বাজারে বের হয়ে গেল। বোসো না। চলে আসবে।

না রে বসব না।

কিছুটা বিষণ্ণ মুখ, কিছুটা হতাশ গলা, লীলাদিকে কেমন চেনা যাচ্ছে না। বিপদের গন্ধ থাকতে পারে। তার মানুষটার কাছে আপদে বিপদে লোকজনের ছোটাছুটির খামতি নেই। কিন্তু লীলাদি কেন। সে তো তার বিপদে আপদে মানুষটার কাছে কখনও আসে না। মানুষটা যে তার সিদ্ধ পুরুষ, গুপ্তবিদ্যার অধিকারী— মানুষটা তার কারও উপকার ছাড়া অপকার করে না, লীলাদির আচরণে কথাবার্তায় তা টের পাওয়া কঠিন। সেই লীলাদি আজ হেরম্ব সাধুর খোঁজে এসেছে। কখনও লীলাদি তার নামও করে না। বরং মালিনীকে বলেছে, তোর সহ্য শক্তি অসীম। তুই পারিস বটে।

সাধুকে খাটো করে দেখলে মালিনীর খারাপ লাগে। ওই একটা বদ অভ্যাস। রেগে গেলে চণ্ডমূর্তি— মাথা ঠিক রাখতে পারে না— লীলাদি জানেই না, এই গুপ্তবিদ্যাটি জানে বলে তাকে রসেবশে রাখতে পেরেছে। কামসূত্র কত প্রকারের হয়, তার বিন্যাস, তার প্রয়োগ রাতের বেলা নেশা ধরিয়ে দেয়। তার শরীরের গরম তো সহজে মরে না। সে দেখেছে উত্তপ্ত আধারটিকে সহজেই সাধু নানা প্রক্রিয়ায় শীতল করে দিতে পারে। মালিনী বহু পুরুষের মনোলোভা— সে তার দুই প্রেমিক এবং স্বামীর ঘর ছেড়ে সাধুকে নিয়ে যে আছে— তা ওই এক কারণে। শরীর তো বোঝে না। এমনকি পেটালেও রমণের সুখের মতো আবেশ সৃষ্টি হয়, লীলাদি বুঝবে কী করে !

তা হলে বসবে না !

বসলে চলবে না। দেরি হয়ে যাবে। খোকা ঘুম থেকে উঠেই খোঁজাখুঁজি করতে পারে।

তবে যাও। এলে পাঠিয়ে দেব।

না না। পাঠাতে হবে না। দেখি সময় পাই তো আমি নিজেই আসব।

মনটা ভার হয়ে আছে। কী যে করে ! কোয়ার্টারে ফিরতেও ইচ্ছে হচ্ছে না। হিরার কাছে গেলে হয়। তার ঘরে বসলে হয়। ঘরে ফিরে গেলেই রাতের দুঃস্বপ্ন ফের চেপে বসবে। এদিক ওদিক ঘুরে কোয়ার্টারে ফিরতে বেশ বেলাই হল।

ঘরে ফিরে দেখল, খোকা জামা গায়ে চাদর গায়ে কোথায় বের হচ্ছে।

কোথায় গেছিলে ? ডাকাডাকি করেও সাড়া পেলাম না।

মালিনীর বাসায় বললে খোকা ক্ষুব্ধ হতে পারে। বলা ঠিক হবে না। খোকা নিজেও এখন মালিনীর বাসায় যেতে চায় না। খোকা নলিনীর আবদার সহজেই উপেক্ষা করতে পারে। নলিনীর গা চাটা স্বভাব। পুরুষ দেখলেই হল। পাঁচ সাত বছরের ছোট বড় হবে। মালিনী এখানে বদলি হয়ে আসার সময় নলিনী হামা দিত। খোকার কাছে

পূজনের কাছে জিম্মা রেখে মালিনী ডিউটিতে যেত। এক বিছানায় খোকা সে আর নলিনী কত রাত কাটিয়েছে। সেই সূত্রে নলিনী এই বাসার অনেক অধিকারও পেয়ে গেছে। বয়স হলে সব কিছু শোভা পায় না বোঝে না।

এই নলিনী খোকার ঘরে কী করছিস ?

শুয়ে আছি মাসি।

খোকা কোথায়।

তোমার খোকা লিখছেন।

তোর আবার ও ঘরে যাবার কী হল। ওকে কাজ করতে দে।

এই শুনছ। মাসি কী বলছে। তোমার কাজে বাধা দিচ্ছি।

কটমট করে তাকালে খোকা আর কী বলে।

না, মা আমি লিখছি। ও বিছানায় পড়ছে। আমার কাজে বাধা দিচ্ছে না।

লীলা বিরক্ত হত। পূজনও। মালিনী বলত, ওর তো দাদা নেই, কী করবে বল ! সময় পেলেই চলে যায়। স্কুলের কোনও পড়াই পারে না। আমিই বলেছি, খোকার তো শুনছি নাম যশ হচ্ছে। ওকে গিয়ে ধর। পড়া বুঝে নে।

তা পড়ার অজুহাতে নলিনী খোকার ঘর থেকে নড়তেই চায় না। আজকাল খোকা দরজা বন্ধ করে বসে থাকে।

দরজায় ধাক্কা।

খোকা সাড়া দেয় না।

আমি নলিনী। দরজা খোলো।

নলিনী আমার কপালটা ব্যথা করছে। জ্বর আসবে বোধহয়। ফ্লু হয়েছে। বুঝলি। পরে আসিস।

কথা শোনার পাত্রী নলিনী ! সে দরজা ধাক্কাচ্ছে।

পূজন না পেরে বলত, কী হচ্ছে ! যা বাড়ি যা।

মা বাসায় নেই। নলিনী একমাত্র লীলা মাসিকে ভয় পায়—কিংবা সমীহ করে— যাই হোক, সে কিছুটা পিছু লাগার জন্যই জানালায় গিয়ে দাঁড়ায়। তারপর কাগজের দলা পাকিয়ে কাঞ্চনকে ঢিল ছুঁড়তে থাকে।

লীলা লক্ষ করেছে, আজকাল নলিনী এলে খোকার মুখ খুব করুণ দেখায়। সময় নাই অসময় নাই, খোকার উপর উপদ্রব শুরু করে দেয়। সে বাসায় থাকলে বাড়াবাড়ি করতে পারে না। কারণ লীলা, না বলে পারেনি, তোরা এখন বড় হয়েছিস। বড় হলে যখন তখন যার তার ঘরে ঢুকে যেতে নাই। নিজের দাদার ঘরেও না। তুই খোকাকে বড় জ্বালাস।

না মাসি, কাঞ্চনদাই আমাকে জ্বালায়।

খোকা জ্বালালে জ্বলতে আসিস কেন।

কী করব মাসি, কাঞ্চনদা যে আমাকে ডাকে।

লীলা তাজ্জব হয়ে গেছিল কথাটা শুনে। খোকার নামে অপবাদ। সে কখনও নলিনীকে আসতে বলতে পারে। যা শীত কাতুরে ছেলে। সব সময় শরীরে শীত শীত ভাব। এত ঠাণ্ডা কোথায় ! গরমেও খোকা চাদর গায়ে দিয়ে থাকে। ডাক্তার কবিরাজ কম করেনি—ভিটামিন রাশি রাশি গিলিয়েছে— এখন অবশ্য খোকা নিজের পছন্দমতো ওষুধ খায়। সর্দি কাশির ধাতের জন্যই হোক, আর হাসপাতালের বাতাসেই হোক, খোকা

রোগ ভোগের অনেক খবর রাখে। রোগ ভোগে কার কী ওষুধ সে নিজেই জেনে ফেলেছে। সে বেশি হাওয়া দিলে দরজা জানালা বন্ধ করে শুয়ে থাকে। এটা কি তবে অজুহাত। লীলার মনে নানা ধন্দ।

কোথায় গেছিলে এত সকালে !

লীলার যেন সম্বিৎ ফিরে আসে।

লেবার রুমে।

মিছে কথা বলে যদি পার পাওয়া যায়। লেবার রুমে নানা কারণেই তার যখন তখন ডাক পড়ে। যদিও নিয়ম নয়—তবু ডাক্তারবাবুরা যে যখন ডিউটিতে থাকে জটিল কেসে লীলাদির পরামর্শ নেয়। স্যালাইন চালিয়ে কাজ না হলে লীলাদি নিজে একবার চেষ্টা করেন। ধাত্রীবিদ্যায় এটা হয়নি, অভিজ্ঞতা তাকে অনেক কিছু শিখিয়েছে।

তুই কোথায় চললি ! এত সকালে। সাইকেল নিয়ে কোথায় যাচ্ছিস !

কিরণদার বাড়ি।

হঠাৎ কিরণদার বাড়ি !

বাসায় টিকতে পারছি না বলতে পারত। তবে বলল না। কারণ মা ঘরে ঢুকলেই টের পাবে নলিনী পাশের ঘরে শুয়ে আছে। সক্কাল বেলায় শরীরে নাকি গরম ধরে গেছে। থাকতে পারেনি। তাকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেয়েছে। বুকের সেফটিপিন খুলে দিয়েছে। আরও সব কুচ্ছিত ভঙ্গি যা সে আদৌ সহ্য করতে পারে না। বার বার বলেছে, তুই যা। পাগলামি করিস না। আমার শরীরটা ভাল নেই। দ্যাখ গায়ে হাত দিয়ে— আর যায় কোথায়, ওম নেবার মতো তাকে জড়িয়ে ধরে বিছানায় নিয়ে যেতে চেয়েছিল। মাসি বাজারে, মা বাড়ি নেই— সুযোগ বুঝে ঘরে ঢুকে গেছে। গরম ধরে গেলে মাথা যে ঠিক থাকে না, নলিনীর আচরণে সে তা টের পেয়েছে। আশ্চর্য সব অজুহাতও তৈরি করতে পারে মেয়েটা। পড়া দেখিয়ে দেওয়ার অছিলা তো আছেই, তা ছাড়াও সে মায়ের সেবা শুশ্রূষার সুযোগও নেয়।

মা এ জন্য বড় দুর্বল।

মাসি একটু কিছু খাও।

না রে খেতে ইচ্ছে করছে না।

রসুন তেল মেখে দিচ্ছি। দ্যাখো আরাম পাবে।

রসুন তেল মাখিয়ে দিলে মা সত্যি আরাম পায়। বুকে পিঠে সে তেলটা ডলে দেয়। মা চোখ বুজে পড়ে থাকে। জোরে জোরে শ্বাস ফেলে।

কম মনে হচ্ছে না মাসি !

মা মাথা ঝাঁকায়।

দাঁড়াও বালিশটা উঁচু করে দিচ্ছি।

ছোট্ট মেয়ের মতো মায়ের মাথা তুলে ধরে নীচে আর একটা বালিশ ঠেলে দেবে।

বালিশটা দেবার আগে থাপ্পড় মেরে নরম করে ওয়াড় টেনে বেশ পরিপাটি করে দেয় বালিশটা। এত যত্ন যেন পূজন মাসিও তখন করে না।

ইনসিডাল খাওয়ার সময় হয়েছে।

কিছু বলছিস !

কাশি হাঁচিতে কী কষ্ট পাচ্ছ বল তো। নাও খাও।

মা তখন বালিকার মতো উঠে বসে। কাঞ্চন মায়ের কষ্ট দেখতে পারে না বলে কাছে

যেতেও সাহস পায় না। বারান্দার জানালায় মাঝে মাঝে লুকিয়ে দেখে। মার চোখে ঝিমুনি এলে সাদা চাদরে ঢেকে দেয় মাকে। তারপরই ছুটে তার ঘরে চলে আসে।

ফ্রক পরা মেয়েটা যে কচিখুকি নয়, তার নিপুণ সেবা শুশ্রূষা দেখেও টের পাওয়ার কথা—কিন্তু পূজন মাসি নিজের কাজ হালকা হচ্ছে ভেবেই হোক, অথবা আপদে বিপদে মেয়েটার সাহায্য পাওয়া যায় ভেবেই হোক, বড় খুশি থাকে। নলিনীর তখন অবারিত দ্বার, তার ঘরেও। জলের গ্লাস, কাপ ডিশ সব তার খাটের নীচে। উবু হয়ে ঢোকার আগে চোখ তুলে তাকে দেখবে।

ফিসফিস করে বলবে, মাসি ঘুমাচ্ছে।

হয়ে গেল। সে যে বলবে, আঃ কী জ্বালাস বল তো, যা। বলছি যা। আমার ভাল না লাগলে কী করব। তোর আরশিতে আগুন, আমি পুড়ে মরি তুই চাস? আর কাউকে খুঁজে পাচ্ছিস না!

তোমার শরীরে বুঝি আগুন নাই।

না। নাই। আচ্ছা তুই কী রে। ভয় করে না। কিছু যদি হয়ে যায়।

কেন হবে! আমি তো পিল খাই।

হেলথ সেন্টারে এই এক জ্বালা। বড় হতে হতে সব জেনে যায়। গ্রাম সেবিকাদের কথাবার্তা থেকেই জেনে নিতে পারে। কিছুই গোপন থাকে না। টিভি-তে বিজ্ঞাপন। এবং এরা সব টিভি চাইল্ড। কিছুই শেখাতে হয় না। সর্বত্র ঝরা পাতার মতো জন্ম নিয়ন্ত্রণের খবরাখবর ওড়াউড়ি করে।

তুই পিল খাস, পিল খেলে শরীরের অনিষ্ট হয় জানিস।

বাব্বা, তুমি দেখছি ডাক্তারবাবু। আমার অনিষ্ট আমি বুঝি। মেলা বকিয়ো না।

ঠিক আছে। বকাব না। দয়া করে যা। না হয় পড়। মাথাটা তোর সত্যি গেছে। এত শিখে গেছিস—তোর সঙ্গে আমি পারি!

পারবে কেন। পারলে দূর ছাই কর! তোমার কিছু নাই।

খুবই অপমানকর কথা। কাঞ্চন বোঝে। হয়তো তার শরীরের আর খামতিগুলোর মতো এটাও এক ধরনের অক্ষমতা। না কি সে মেয়েদের বেহায়াপনাকে ঘৃণা করে। তার তো ইচ্ছে হয়—তবে সে ইচ্ছেটা জোরজার করে নয়। চোরের মতো লুকিয়ে চুরিয়ে কিংবা পুরুষ উপগত হবে, আবেশে। তার চোখে বিবশ নেমে আসবে। নলিনীকে দেখলে আবেশের নাম গন্ধ থাকে না। কেমন দজ্জাল মেয়ের মতো প্যান্ট খুলে, দে হাত দে। জড়িয়ে ধর। গরম ধরে গেলে নলিনীর তুই তুকারি করার স্বভাব। ধমকে ধামকে কাত করা যে যায় না, তার সব শীতল তুষারের মতো পত্রহীন পুষ্পহীন গাছ হয়ে যায় নলিনী বোঝে না। ভাল না বাসলে মেঘ হয় না, বৃষ্টি হয় না, তাও নলিনীর বুঝি জানা নেই।

দ্যাখো কাঞ্চন দা, সাবধান করে দিচ্ছি। এমন শিক্ষা দেব, বুঝবে পরে মজা। বলছি বিছানায় এসো।

কাঞ্চন কেমন কাঁপতে থাকে। উলঙ্গ নারী শুয়ে আছে। ফ্রক প্যান্ট পায়ের নীচে। জানালা দরজা বন্ধ। আলো জ্বালায়নি। আবছা অন্ধকার। সকালবেলায় এ কী শুরু করল নলিনী।

আমি এবারে কিন্তু—আরে এসো না। ইস তুমি কী। তোমার ও দুটো কি তেঁতুল বিচি! থেঁতলে গেছে।

এই হাত দিবি না। তোর বড্ড নোংরা স্বভাব নলিনী। ওঠ, ওঠ, বলছি।
না উঠব না। কী করবে! ভয় দেখাচ্ছে!
সাপের মতো ফোঁস করছে নলিনী।
ভাল হবে না বলছি। ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করে দেব।
দাও না। দেখি মুরোদ। ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করে দেবেন। কিছু তেনার ওঠেনি! কিছু জানে না।
কাঞ্চন এমন নির্লজ্জ মেয়ের পাল্লায় পড়ে থতমত খেয়ে যায়। ঘরের এক কোণে পাজামা পাঞ্জাবি চেপে দাঁড়িয়ে আছে। আগুনের মতো চোখ জ্বলছে নলিনীর। ক্ষেপে গেছে যেন। তার বড় ভয় করে। দস্যি মেয়ে, ইচ্ছা করলে তাকে যেকোনও ভাবে উলঙ্গ করে দিতে পারে।
এই আমার পেচ্ছাপ পেয়েছে নলিনী। দাঁড়া আসছি। ছাড় ছাড় বলছি।
দরজা খুলবে না।
আরে জামা প্যান্ট নষ্ট হয়ে যাবে।
নলিনীর কান্না পায়। কী মানুষ গো। কত বড় তুমি—তোমার মুখ-চোখ এত সুন্দর। গালের দাড়ি নবীন সন্ন্যাসীর মতো। মেয়েমানুষ দেখলে তোমার শুধু পেচ্ছাপ পায়। আর কিছু পায় না।
নলিনী ওর বুকের উপর মুখ ঘসতে ঘসতে দুমদাম কিল মারতে থাকে।
পেচ্ছাপ পায় কেন! বলো, আমি এত খারাপ, আমার সব দেখলে শুধু তোমার পেচ্ছাপ পায়।
কী করব! পেচ্ছাপ পেলে কী করব বল!
পেচ্ছাপই করো। যা খুশি করো। ঘর খুলবে না।
ধুস। ছাড় বলছি। বলেই সে দরজা খুলে ছুটে বের হয়ে গেছিল। আর বাথরুমের দরজা খুলে কোনওরকমে শরীরের গ্লানি ঝেড়ে সে আর ও-ঘরেই ঢুকল না। মার ঘরে ঢুকে দরজা পার হয়ে বারান্দায় বের হয়ে এল। তার শরীর কেন যে থরথর করে কাঁপছে।
পূজন মাসি বাজার থেকে ফেরেনি। বাস-স্ট্যান্ডের বাজার। কিছু দূরগামী বাসও ওখান থেকে ছাড়ে। বাসে শহরেও যাওয়া যায়। তবে বাসে ওঠাই মুশকিল। উঠলেও তার যা শরীর ভিড়ের চাপে হাওয়া হয়ে যেতে পারে। সে পারতপক্ষে বাসে শহরে যায় না। সাইকেল সম্বল করে বের হয়ে পড়ে।
সে নিজের আত্মরক্ষার্থেই সাইকেলে করে বের হয়ে যাবে ভাবল। প্যাজামা পাঞ্জাবি পাল্টানো দরকার। কোয়ার্টার খালি রেখে যাওয়াও যায় না। মা হয়তো হেলথ সেন্টারে গেছে। ডিউটি না থাকলেও যেতে হয়। তবু ডাকল, মা। বারান্দা পার হয়ে মালিনী মাসির জানালায় উঁকি দিল। কেউ ঘরে নেই। হেরম্ব সাধুর খুব সকাল সকাল ওঠার অভ্যাস। অদূরে গঙ্গা। সূর্য ওঠার আগে সে গঙ্গা স্নান করে ফিরবে। রাস্তায় গঙ্গাজল ছিটিয়ে পবিত্র করে নেয়। আর নানা স্তোত্রপাঠ। তারপর থলে হাতে বাজার। সকাল সকাল বাজারে না গেলে পছন্দমতো কোনও জিনিসই পাওয়া যায় না।
সে বারান্দা থেকে নেমে ডাকল, মা আমি বের হব।
সাড়া নেই কোথাও।
অগত্যা ঘরে ফিরে দেখল, পূজনমাসি বাজার গোছাচ্ছে। সে ডাকল, মাসি আমি বের

হব। ঘর থেকে পাজামা পাঞ্জাবি বের করে দাও। মা যে কোথায় গেল!

মালিনীদের কোয়ার্টারে নেই?

না তো। ডাকলাম সাড়া পেলাম না।

বলে গেল, চা ওখানে দিয়ে আসতে। গেল কোথায়!

কী জানি!

তুই নিয়ে নিতে পারছিস না। আমার হাত জোড়া—কখন করি। তুই কি বের হচ্ছিস!

ভাবছি।

তোর কথার মাথামুণ্ডু কিছু বুঝি না। হুট করে বের হয়ে গেলে দিদি আমাকে আস্ত রাখবে! কিছু খেলি না!

খেতে ইচ্ছে করছে না।

ইচ্ছে না করলেও খেতে হবে। দুধ গরম করে দিচ্ছি। দুধ রুটি খা। না খেলে পিত্তি পড়বে।

ঠিক আছে খাচ্ছি। আগে ও-ঘর থেকে আমার পাজামা পাঞ্জাবি বের করে দাও।

সহসা পূজনমাসি ক্ষেপে গেল।

আমি তোদের মাস মাইনের নকড়ানি নই। নিজে নিতে পারিস না। কোনদিকে যাব! কেবল হুকুম করতে জানিস। সকাল থেকে একদণ্ড ফুরসত নেই। তিনি গেলেন টোলাতে। শরীর ভাল না। বাড়িতে থাক। না হয় রেল-পাড়ে হেঁটে আয়। তা না, কার ঘরে গিয়ে লেপ্টে গেছেন।

কাঞ্চন মাসিকে এ-সময় খুবই তোয়াজ করে চলে। মাসি এক হাতে সংসার চালায়। মেসো কেন যে মাসিকে তাড়িয়ে দিল, মাসি দেখতে ভারী মিষ্টি। মায়ের মতো তার সুন্দর মুখ। দিদির বাড়িতে পড়ে আছে। মেসোর কথা কোনওদিন মুখে উচ্চারণ করে না। মা হয়তো সব জানে। মেয়েরা এক আশ্চর্য রকমের নিঃসঙ্গ থাকে ভিতরে! জল জমে থাকে—বৃষ্টি হয় না, ঝড় হয় না। জল জমে জমে দুর্গন্ধ উঠে যাবার কথা। কিন্তু মাসিকে দেখলে মনেই হয় না, তার ভিতরে কোনও জলাশয় আছে। ঢেউ আছে। বড় নিস্তরঙ্গ জীবন। যেন মেয়ে হয়ে জন্মানোর অশেষ শিক্ষা সে পেয়ে গেছে। জলাশয়ে আর কখনও ঢেউ উঠবে না।

তার এই হয়। বাছ বিচার না করে সে কিছু মেনে নিতে পারে না। মাসি এত সুন্দর, এত পলকা, কোনও খণ্ড মেঘের মতো নিঃস্ব সৌন্দর্য তার শরীরে, তবু কেন মাসি পরিত্যক্তা। মেসোর কাছে গেলে মাসি কি কোনও দুর্গন্ধ পেত। কিংবা মেসো মাসির কাছে গেলে! অথচ মাসি, রোজ বিকালে পায়ে আলতা দেয়, কপালে সিঁদুর। বিকালে ইস্ত্রি করা শাড়ি পরে। মুখে পাউডার, এবং শরীরে আতর মেখে শুয়ে থাকে। রাজ্যের কাচাকাচি, রান্না, ইস্ত্রি করা বাজার থেকে সব এবং মায়ের সেবা শুশ্রূষা। শুধু বিকেলটুকু মাসির নিজস্ব। তখন মাসি মাদুর বিছিয়ে মেঝেতে ঘুমায়। ঘুমায় না স্বপ্ন দেখে বোঝে না। মার তখন যত দরকারই থাকুক—মাসিকে ডাকে না। খাটায় না। মাসি এই দুর্লভ অবসরটুকু পায় বলেই যেন এখানে পড়ে আছে।

কবে যেন একবার মা বলেছিল, পূজন তুই হেরম্ব সাধুকে ধর। সে পারবে। ঘাড় ধরে নিয়ে আসবে। তার মন্ত্রশক্তি প্রবল। সে গুপ্তবিদ্যার অধিকারী। তুই যদি বলিস, মালিনীকে বলে তোকে সে উদ্ধার করে দিতে পারি কি না দেখি।

মাসি বলেছিল, উদ্ধার করবে, না আমাকে খাবে।
খাবে কথাটার এত কদর্য অর্থ হয় আগে সে বুঝত না।

॥ ৪ ॥

বাইরের দিকের জানালাটা খোলাই আছে। জানালা খোলা থাকলে দরজাও খোলা থাকে। কাঞ্চন আশ্বস্ত হয়। নামকা ওয়াস্তে দরজায় শেকল তোলা থাকে। আরও কাছে না গেলে বোঝা যাবে না। ঘরটা বাড়ির বাইরের দিকে। বলতে গেলে কিরণদা ঘরটা তাদের ছেড়েই দিয়েছেন। তবে মাঝে মাঝে বাড়ির কেউ ভিতর থেকে দরজাটা বন্ধ করে দেয়। দরজাটা বন্ধ করে দিলে জানালাও বন্ধ করে দেয়। জানালা যখন বন্ধ নয়, তখন ঘর খোলাই আছে। শেকল খুলে ঢুকে যাওয়া। তারপর সটান শুয়ে পড়া। নলিনীর তাড়া খেয়ে এতদূর ছুটে এসেছে প্রায় বলতে গেলে আত্মরক্ষার্থে।

বাড়ির সামনে অনেকটা খোলামেলা জায়গা। কিছু আম জাম পেয়ারা গাছের ছড়াছড়ি। পাঁচিল কোমর সমান উঁচু। পাঁচিলের পলেস্তারা খসে পড়ছে। বাড়িটারও। কিরণদার দাদুর আমলের বাড়ি। কোনও শরিক নেই। কিরণদা এ-সময়ে যে বাড়ি থাকবেন না সে জানে। অফিসে বের হয়ে যাবেন। অথচ ঘরটা কে কখন আসে ভেবে খোলা থাকে। যেই আসুক ঘরটা খুলে বসতে পারবে, শুতে পারবে। ইচ্ছে করলে টানা ঘুমও দিতে পারে। ঘরটায় শুয়ে থাকলে, বসে থাকলে আশ্চর্য এক নীরবতা টের পায় সে—এবং এই নির্জনতা তার এত ভাল লাগে কেন বোঝে না। ঘরটায় কে ঢুকল, কে শুয়ে থাকল, কে বের হয়ে গেল দেখার যেন কারও বিশেষ গরজ নেই।

আশ্চর্য এত বড় বাড়ি উকিল পাড়াতে কমই আছে। আর কতটা জায়গা নিয়ে! কিরণদার দাদু যে শৌখিন মানুষ ছিলেন বুঝতেও কষ্ট হয় না। মারবেল পাথরের মেঝে—ঝাড় লণ্ঠনও কোনও ঘরে দুলছে। কিরণদার বাবাও জজকোর্টে যেতেন। ওকালতি নাকি তাদের বংশগত পেশা—কিরণদাই বলেন, আমরাই ছিটকে গেলাম। বাবা নিখোঁজ হয়ে যাবার পর মার মাথা ঠিক ছিল না। কে কী করবে যেন নিজেরাই ঠিক করে নিই।

দ্যাখ না, আমি হয়ে গেলাম অফিসের বড়বাবু। আমার তো বড়বাবু হওয়ার কথা না। বাবা যদি ফিরে আসেন, তবে তুলকালাম করে ছাড়বেন। পরের গোলামি!

নিখোঁজ কেন, খুন-টুন, না অন্য কোনও নারীঘটিত ব্যাপার বিশদ জানার আগ্রহ তার কখনও হয়নি। কিরণদাও পরিবারের এই অধ্যায়টুকু মনে রাখতে চান না। হাসি ঠাট্টা তামাসা, সাহিত্য পাঠের সময় চোখ বুঝে গল্প কিংবা কবিতার প্রতি প্রিয় ইচ্ছাপূরণের পালা চলে—সংসারের আসল মানুষটিই নিখোঁজ—তার কি এই সব শখ মানায়। কাঞ্চন না ভেবে পারে না।

সে গেট খুলল। এক হাতে সাইকেল অন্য হাতে গেট ঠেলে ভিতরে ঢুকে গেল। তারপর আলগা করে গেট লাগিয়ে বুঝল, শেকল তোলা আছে। মোরাম বিছানো রাস্তা। ঘাস ফুল প্রজাপতি ফড়িং ওড়াওড়ি করছে। বাড়িটা আশ্চর্য নীরব। যেন কেউ নেই বাড়িতে।

গাছের ছায়ায় বাড়িটা ঢেকে আছে।

পাষাণপুরীর গল্প সে মায়ের কাছে শিশু বয়সে শুনেছে। সেই শিশু বয়সের স্মৃতি

বাড়িটায় ঢুকলে কেন যে মাথায় দাপাদাপি করে। বাড়িতে কাজের লোক বশিষ্ঠ, কিরণদার বাবার আমলের শুধু না, প্রায় বলতে গেলে দাদুর আমলের—এখন আর সোজা হয়ে হাঁটতে পারে না। মাঝে মাঝে তাকে অবশ্য দেখা যায়—বাগানে লাঠি ভর করে চুপচাপ তাকিয়ে আছে বাড়িটার দিকে।

সেও আজ বাগানে নেই।

ঘরটার সামনে খোলা চাতাল। চাতালে সাইকেল তুলে তালা মেরে শেকল খুলে ভিতরে ঢুকে গেল। বাইরে তাপ আছে। কালবৈশাখী, শিলাবৃষ্টিতেও পৃথিবী ঠাণ্ডা হয়নি। ঘামে জব জব করছে শরীর। ভিতরে ঢুকতেই কেমন শীতল এক ঠাণ্ডা ভাব—বসলেই ঘুম পায়। ঘরটা নেহাত ছোট নয়। লম্বা তক্তপোশ, বেঞ্চ, চার পাঁচটা কাঠের চেয়ার। সিলিঙে কাঠের বরগা। ঘুণের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য কালো আলকাতরা মাখানো। সিলিং-এ কোথাও চটা ওঠা। দেয়ালেও। লাল মেঝে। মসৃণ এবং এই লাল মেঝের মসৃণতাই বোধহয় ঘরটাকে উত্তপ্ত হতে দেয় না। ঠাণ্ডা রাখে।

তক্তপোশে পাটি পাতা। সে চাদরটা খুলে তক্তপোশটা ভাল করে ঝেড়ে নিল। ভিতরের দিকের দরজা খুলে কেউ উঁকি দিয়ে দেখে না, তাও নয়। একবার খুলে যাবেই। কে এল দেখে নেওয়া। মাসিমাকে সে কখনও দরজা খুলতে দেখেনি। বাড়িটার কোনদিকে তিনি থাকেন তা জানে। তবে সে এলে যে দরজা খুলে উঁকি দেয়, নিশ্চয় সে আসবে। হয় বশিষ্টদা, নয়তো ফ্রক পরা মেয়েটা। চাপা ফুলের মতো গায়ের রঙ। নিষ্পাপ মুখ। চোখ দুটি এত বড় যে দুগ্গা ঠাকুরকে হার মানায়। চোখে সব সময় প্রকৃতির নীরব সুষমা—যা দেখলে তার ভয় করে। ওর তো দুই দিদি সন্ন্যাসিনী। কাঞ্চনের কেন যে মনে হয়, একদিন একেও তারা সঙ্গে নিয়ে যাবে। শুধু বালিকা বলে পারছে না।

চাদরটা ভাঁজ করে নিল শিয়রে দেবার জন্য। কড়া রোদ্দুর বাইরে। জানালা বন্ধ করে দিলে ভাল হয়। অন্ধকার তার প্রিয়, আলো বেশি সহ্য করতে পারে না। সে জানালা ভেজিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল। সে ইচ্ছে করেই রাস্তায় দেরি করেছে। কিরণদার সঙ্গে দেখা হয়ে গেলে মুশকিলে পড়ে যাবে!

কী রে তুই!

না মানে।

মানে তোর বের করছি! এলি না কেন!

শরীরটা ভাল ছিল না কিরণদা।

রাখ বাজে কথা। সবাই আমরা হতাশ। তোর পাত্তা নেই। তোর ছোড়দি তো ঝুল বারান্দা থেকে নড়লই না। আসলে তুই আমাদের অপমান করে সুখ পাস।

না না। সত্যি বলছি। লেখাটা হল না। আমার হবে না। এসে কী করব!

তার না আসাটা অনুষ্ঠানের সবারই নজরে পড়ে থাকবে। দেখা হলেই বলবে, ভারী অন্যায়। ছোড়দি সীতেশদা, সবাই খেপে আছে। সে তো জানে, সবাই এসে এই একটা কথাই বলবে।

কাঞ্চনকে দেখছি না। ও কী ভাবে নিজেকে।

ভাঁজ করা চাদরে মাথা রেখে সে শুয়ে পড়ল। কিরণদা নেই। বাঁচা গেছে। কেউ আর কৈফিয়ত চাইবে না।

আর ঠিক এ-সময়েই ভিতরের দরজা খুলে বাণী উঁকি দিল।

কাঞ্চনদা !

কিছুটা অবাক। কিছুটা অসময়ে কাঞ্চনদা আসায় বাণী প্রথমে খুব সরব হতে পারল না। বাণীর সঙ্গে তার কথা বলতে ভাল লাগে। কিন্তু তার আড়ষ্টতা তাকে সহজ হতে দেয় না। অসময়ে সে কখনও আসে না। বিকেলে বা সন্ধ্যায় সে আসে। একটা র‍্যাকে পুরনো বইপত্র, প্রবাসী, ভারতবর্ষ থেকে এখনকার দৈনিক সাপ্তাহিক সব সাজানো থাকে। সে র‍্যাক থেকে যা হাতের কাছে পায় তুলে নিয়ে বাণীর দিকে না তাকিয়েই কথা বলার চেষ্টা করে, এতটুকু মেয়ের কাছে এ-ভাবে জব্দ হওয়াটা আদৌ সম্মানের নয়। সে বলল, স্কুল নেই তোমার ! বাড়িতে একা কী করছ !

স্কুল ছুটি। বড়দা তো অফিসে বের হয়ে গেছে।

তার হাতে ঘড়ি নেই। সে কিছুটা অন্যমনস্ক গলায় বলল, কটা বাজে ! দেরি করে ফেললাম !

যাও না। দাদার অফিসে চলে যাও। দাদার সঙ্গে ঠিক দেখা হয়ে যাবে।

এক গ্লাস জল খাব। জল আছে ?

বাণী কাঞ্চনদার সামনে দাঁড়িয়ে হেসে ফেলল। কাঞ্চনদার কথাবার্তা কেমন আড়ষ্ট ধরনের। ঠিক কী বলতে হবে বোঝে না। না হলে কেউ বলে, জল আছে ?

সে দৌড়ে বের হয়ে গেল।

ইস, এই মেয়েটাকেও একদিন তার দিদিরা সন্ন্যাসিনী করে ছাড়বে। মেয়েটার দৌড়ে যাওয়া দেখে তার কষ্ট হচ্ছিল। কিরণদার দুই বোন যখন আশ্রমে ঢুকে গেছে, একেও তারা না নিয়ে গিয়ে ছাড়বে না। দুই বোনের কাউকে সে দেখেনি। কত বয়স হবে ! তার বয়সী, বেশি হলে না হয় আরও পাঁচ সাত বছরের বড়। তাই বা কী করে হবে। কিরণদার নিজেরই বয়স এত নয়। তারপর এক ভাই, পরে দু বোন, শেষে আর এক ভাই, সব শেষে বাণী।

কলকাতার পাইকপাড়ায় সে একবার আশ্রমের দু'জন তরুণী সন্ন্যাসিনীকে দেখেছিল। রাস্তায় নয়, কমলেশের বাড়িতে। ওরা আশ্রমের জন্য যে যা দেয় নেয়। কমলেশের বাড়িতেও তারা এসেছিল, আশ্রমের জন্য দান গ্রহণ করতে। সাদা চাদরে শরীর ঢাকা। মোটা খদ্দরের শাড়ি। পায়ে সস্তার জুতো। চুল খোপা করে বাঁধা। কারো দিকে তারা তাকায় না। কাউকে দেখে না। তাকেও দেখেনি। নবীন সন্ন্যাসিনীদের দেখে তার মনে হত এরাই কিরণদার সেই দুই বোন। জলি, মলি। কোনও মানসিক যন্ত্রণা থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য তারা সন্ন্যাসিনী। এখন তারা জলিও নয়, মলিও নয়। এখন তারা পরিব্রাজিকা। আর আশ্চর্য এই বাড়িতে এলে সে ভেবেই ফেলে, তার দেখা দু'জন সন্ন্যাসিনীই কিরণদার বোন না হয়ে যায় না। তাদের চেহারাই সে মনে করতে পারে। কিরণদার দুই বোন অর্থাৎ সেই হেমন্তের সকালে দেখা ছবিটাই সে এ-বাড়িতে দেখতে পায়। আর সবাইকে চেনে। শুধু কিরণদার দুই বোনকে সে কখনও দেখেনি। এই বাড়ির চেনার জগতে তার দেখা মেয়ে দু'জনও জায়গা করে নিয়েছে। ভাবলে কষ্ট হয়। বাড়ির সঙ্গে কোনও আর সম্পর্ক নেই। তবু ওরাই এ-বাড়ির জলি মলি ভাবতে ভাল লাগে। বোনেদের বিষয়েও কিরণদা বড় নীরব।

সাদা পাথরের গ্লাসে জল। বাণী একটা সাদা পাথরের রেকাবিতে জলের গ্লাস নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

কাঞ্চন গ্লাসটা হাতে নিল। তারপর গ্লাসটা উপরে তুলে আলগা করে এক ঢোক জল

খেল। গলা দিয়ে ঠিক নামল কি না, চোখ বুজে বোঝার চেষ্টা করল। আবার গ্লাসটা উপরে তুলে হাঁ করে আলগা করে জল খেল। ঢোক গিলে জলটা নেমে গেল কি না চোখ বুজে ফের বোঝার চেষ্টা করল।

বাণী হাতে রেকাবি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কাঞ্চনদার স্বভাব সে জানে। বড়দা, কাঞ্চনদার কথা উঠলে থামতে জানে না। মাকে বলে—বুঝলে, জিনিয়াস। তুমি মা ওর গল্প কবিতা পড়ে দ্যাখো। গল্পের ভিন্ন ডাইমেনশান সৃষ্টি করতে চাইছে। গল্পের প্রতিটি লাইনই মনে হবে কবিতা।

বাণী ডাইমেনশান কী জানে না। বড়দা প্রায়ই কথাটা বলে থাকে।

এক গ্লাস জল খেতে কতক্ষণ লাগতে পারে সে যখন বুঝতে পারছে না, চুপচাপ দাঁড়িয়ে না থেকে কৌতূহল নিবৃত্ত করাই ভাল।

ফট করে সে বলে ফেলল, কাঞ্চনদা, আচ্ছা ডাইমেনশান কী বল তো?

ডাইমেনশান। খুব দীর্ঘ স্বরসংযোগ করে সে বলল, ডাইমেনশান, না জানি না। ডাইমেনশান আবার কী!

ও মা দাদা যে বলে, তোমার কী সব ডাইমেনশান আছে—ডাইমেনশান থাকলে জল খেতে বুঝি দেরি হয়।

ও তাই তো। গ্লাসের অর্ধেক জলও খায়নি। টানা কোনও কাজই সে করতে পারে না। কী ভেবে বলল, জলের গ্লাসটা এ-ঘরে কিছুক্ষণ থাকলে তোমাদের কোনও অসুবিধা হবে না তো! বশিষ্ঠদাকে বলো, যেন নিয়ে যায়। তোমার পা ধরে গেছে বুঝি। আচ্ছা আমি শুয়ে পড়ছি।

বশিষ্ঠদা আসতে পারবে না।

কেন, কী হয়েছে!

সে কোনও অপরাধ করে ফেলেনি তো! বশিষ্ঠদা তাকে খুব যে অপছন্দ করে তাও না। কিরণদা বাড়ি না থাকলেও দরজা খুলে উঁকি দেবে। আজ্ঞে দুঃখীবাবু, বড়দা তো বাড়ি নেই। কিছু বলতে হবে? বসুন না। কাছে কোথায় গেছে। এসে যাবে। পাখা চালিয়ে, তক্তপোশ, চেয়ার, গামছায় ঝেড়েপুঁছে বলবে, আজ্ঞে দুঃখীবাবু দাঁড়িয়ে থাকলেন কেন! বসুন।

বশিষ্ঠদা, আমি দুঃখীবাবু নই। আমি কাঞ্চন। কতবার যে মনে করিয়ে দিয়েছে, তাকে দুঃখীবাবু বলার কোনও কারণ নেই। সে কাঞ্চন। তাকে আজ্ঞে আপনি করাটাও শোভন নয়। কিন্তু কে শোনে কার কথা! তাকে দেখলে বশিষ্ঠদার নাকি দুঃখী রাজপুত্রের কথা মনে হয়। চোখে মুখে হাসির ছটা থাকে না। মুখ ভারী ব্যাজার। রাজ্যের চিন্তা মাথায় নিয়ে যেন ঘুরছে। কথাবার্তায় সব সময় সঙ্কোচ। অন্যের অসুবিধা হবে ভেবে সে জোরে শ্বাস নিতেও সঙ্কোচ বোধ করে। এই যে অসময়ে চলে আসা, আর এসেই এক গ্লাস জল চাইতে হল, এটা বশিষ্ঠদা হয়তো সহ্য করতে নাও পারে। কে তোমার জন্য বাপু হাতের কাছে জল নিয়ে অপেক্ষা করবে! মানুষের কি আর কাজ নেই। জল চাইলেই কি পাওয়া যায়। অত হুকুম করার সাহস আসে কোথা থেকে।

আচ্ছা আমি কি উঠব বাণী!

উঠবে কেন। জলটা তবে কে খাবে।

ও তাই তো, মনেই নেই। জল খাওয়া খুবই দরকার শরীরের পক্ষে। জল খাওয়া হলে চলে যাব। পরে গ্লাসটা নিয়ে যেয়ো। কোনও অসুবিধা হবে না তো।

মা দুপুরে খেতে বলেছে।

আমি খাব ?

হ্যাঁ। কেন কোনও অসুবিধা আছে ?

আমি তো খেয়ে বের হয়েছি। দুপুরে খাই না।

মিছে কথা। দুপুরে তুমি ঠিকই খাও। বলো আমাদের বাড়িতে খাবে না। দুপুরে কেউ না খেয়ে থাকে !

আসলে তার এই অসময়ে আসা নিতান্তই গর্হিত কাজ হয়েছে। গেরস্থবাড়ির অকল্যাণ হতে পারে না খেলে। কিন্তু দুপুরে খেতে না হয় ভেবেই তো দুটো আস্ত রুটি ভর্তি এক কাপ দুধ খেয়ে বের হয়েছে। তার যা শরীর সবটা শুষে নিতে দিন কাবার করে দেবে। দুপুরে খাওয়ার অর্থ শরীরের বোঝা বাড়বে। এতটা বোঝা নিয়ে চলাফেরা করতে কষ্ট হবে। ঘন ঘন উদগার উঠলে লোকেই বা কী ভাববে। সঙ্গে ইউনিএনজাইম থাকলেও না হয় কথা ছিল। দ্বিপ্রহরের পাখির আহারটা সেরে ফেলতে পারত। আর খাওয়া তো নয়, বাটি সাজিয়ে যখন দেবেন, তখনই তার মেজাজ অপ্রসন্ন হয়ে যাবে। এত খেলে মানুষ যে শেষ পর্যন্ত পৃথিবীর সব সাবাড় করে দেবে !

আরে ডাল দিয়ে ভাতটা মাখো।

মাসিমা আমি ডাল খাই না।

মাছটা অন্তত খাও।

খেতে বলছেন ! দেখি চেষ্টা করে। মাছ খাওয়া কি ঠিক হবে ? যেন নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও মাছটার কাঁটা বাছতে শুরু করবে। তার খুঁটে খুঁটে খাওয়ার স্বভাব। কাঁটা আলগা করে পাশে নিপুণ শিল্পীর মতো সাজিয়ে রাখবে। ইচ্ছে করলে গুনে নেওয়া যাবে—মাছ থেকে কটা কাঁটা সে বেছে আলগা করেছে, এবং মাছ টিপে টিপে কতটা সময় ধরে এক টুকরো মাছ সে সেবন করল, যে দেখবে তারই মাথা গরম হয়ে যাবে।

অবশ্য মাসিমা রাগ করেন না। শুধু বলবেন, না বাবা, তোমাকে খাইয়ে সুখ নেই। তোমার এত লজ্জা থাকলে বাঁচবে কী করে। চেটেপুটে না খেলে শরীরে কিছু লাগে না, জানো। মা তোমার কিছু বলেন না ! চেটেপুটে খাওয়া শেখায়নি কেন। চেটেপুটে না খেলে খাওয়ার মজা কোথায়।

মার তো—সে ঢোক গিলে বলল, মার সহ্য হয় না। দুপদাপ করে উঠে যায়। মাসিও।

আসলে সে বলতে পারত খাওয়া নিয়ে বাড়িতে বড় অশান্তি হয়। খেতে ইচ্ছে না করলে কী করা ! এটা কেউ বোঝে না। বাণী বোঝে। জল পরে খাবে বলায়, কিচ্ছু বলল না। ঠিক আছে পরেই খেয়ো। কোনও অশান্তি নেই। নলিনীও বোঝে সে খেতে জানে না। এটা তাকে শেখানো দরকার।

সে নিজের মনেই বিরূপ হয়ে ওঠে—আমাকে শেখাবে কী ! সব বুঝি। ইচ্ছেও হয়। রাতে স্বপ্ন দেখি—'কোনও নারী জ্যোৎস্নায় হেঁটে যায় নিঃসঙ্গ অ্যালবামের মতো। শরীরে তার কারুকার্য অধিক—জীবন সে ভোগ করে উরুমূলে এবং স্তনে। তারপর গৃহসজ্জা। জানালায় পর্দা ওড়ে। শরীরে শরীর যোগ হলে নক্ষত্র পতন হয় বার বার। কোনও এক গূঢ় নক্ষত্রের নথিপত্র বগলের নীচে—সে হেঁটে যেতে ভালবাসে।'

নলিনী উরু তুলে চিনিয়েছে জন্মের আধার। বীজ বপনের জলবায়ু ঘোরাফেরা করছে। আবাদের ক্ষেত্র ভিজে উঠছে। বৃষ্টি ঝড় ঘূর্ণি কী না ঘটছে আবাদ সমূহের

কারণে। সে চোখ ফিরিয়ে নিয়েছে—'জন্মের আধার আরও হয়ে উঠুক রহস্যময়—থাকুক আবৃত কুয়াশার জালে।' এত নগ্ন প্রকৃতির সম্মুখীন হতে সে ভয় পায়। আতঙ্কগ্রস্ত করে তোলে তাকে। তখন শুধু তার পেচ্ছাপ পায়। নলিনীকে কী করে বোঝায় অবগুণ্ঠনে থাকে গোপন পিপাসা। সব খুলে দেখালে, 'নারী আর নারী থাকে না। রমণী হয়ে যায়।' নলিনীকে নিয়ে সে এই কবিতা লিখেছে। ছাপাও হয়েছে।

বাণী বলল, তা হলে মাকে বলছি, তুমি দুপুরে খাবে।

না না। শোনো।

বাণী লাফিয়ে ছুটতে চেয়েছিল। সে খপ করে হাত ধরে ফেলল।

না বাণী, আমি সত্যি বলছি খাব না। দুপুরে খেলে আমি বাঁচব না।

দুপুরে খেলেই তুমি বাঁচবে। হাত ছাড়ো।

ও হ্যাঁ, তাই তো আমি তোমার হাত ধরে রেখেছি।

হাত ছেড়ে দিলে, বাণী অপলক তাকে দেখল।

কাঞ্চন দেখতে দেখতে বলল, তোমার দিদিরা কিছু বলেছে! তাকিয়ে আছ কেন!

কী বলবে!

না, যদি বলে, বাড়িটা খালি করে চলে আয়। দিদিরা যেতে বললে তুমি ঠিক চলে যাবে। তোমার খারাপ লাগবে না আমাদের ছেড়ে যেতে? দিদিরা তোমার আসে না?

না।

খোঁজ নেয় না?

না। বড়দি মেজদি আমাদের এখন কেউ হয় না। মা অনুমতি দিয়েছে। মা খুব কাঁদছিল।

ওরা কোথায় আছে!

কে জানে!

দিদিদের কথা বাড়িতে কেউ তোলে না? তার বলতে ইচ্ছে হল বাণীর বাবার কথা। কিন্তু বলতে সাহস পেল না। বাণীকে সুখবরটা দিলে কেমন হয়—জানো তোমার দিদিরা কলকাতায় আছে। আমি কমলেশের বাড়িতে ওদের দেখেছি। খুব সুন্দর দেখতে। কেন যে শেষে বোকার মতো বলে ফেলল, তুমি আরও সুন্দর।

তুমিও।

আমি সুন্দর! কী যে বল না। পাজামা পাঞ্জাবি আমাকে রক্ষা করে আসছে। হাত দ্যাখো। বলে বালকের মতো হাত দুটো ছড়িয়ে দিল বাণীর চোখের সামনে। নীল শিরা-ওঠা হাত। ধবধবে সাদা চামড়ার নীচে শিরা উপশিরা সব দেখা যায়। বড় শীর্ণ আঙুল। হাতের চেটো পদ্মপাতার মতো পাতলা। হাতের ওজন নিলে সামান্য বালিকাও বুঝতে পারবে, সে কেন এত আড়ষ্ট থাকে। আরে,বাণী বলে কী!

তোমার হাতও খুব সুন্দর। লম্বা আঙুল, চাঁপা ফুলের মতো হালকা। ক'জনের হয়!

বাণীকে যতটা বালিকা সে ভাবে, ঠিক ততটা আর বালিকা না ভাবলে তাকে বোধ হয় বেশি সম্মান দেখানো হয়। কিন্তু ভাবতে গেলেই যে নলিনীর মুখ ভেসে ওঠে। নলিনীও পাকা কথা জানে অনেক। পিল খায়।

চাঁপা ফুলের মতো হালকা—ভারী সুন্দর উপমা। এই উপমা ছোড়দির কাছ থেকে শুনলে খারাপ লাগত না। ছোড়দির বয়েস হয়েছে। সীতেশদার সঙ্গে শোয়। ছোড়দির মুখেই এই উপমা মানায়। বাণী এত সুন্দর উপমা সৃষ্টি না করলেই পারত।

বাণীর এই উপমা কিছুক্ষণ তাকে কাতর করে রাখল। ইচ্ছে করলেই আর যেন আগের মতো আদর করা যাবে না। কী যে সুন্দর লাগে—বাড়িতে এমন সুন্দর বালিকা না থাকলে, বড় না হলে গাছে ফুল ফোটে না। সব গাছপালা পাখি প্রজাপতি টের পায়—এই স্বপ্নপুরীতে বাণী আছে। আর কেউ না থাকুক বাণী আছে। তারা বাড়িটা ছেড়ে সে-জন্য যেতে পারে না।

তবে বাণীকে আদর করা গেল না।

হাত ছাড়ো বলল।

কিরণদা থাকলে বাণীর যত সহজ সরল চলাফেরা, না থাকলে তত মন্থর এবং লাজুক। তার সামনে বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতেও লজ্জা পায়। তার যে বাণীকে খুব আদর করতে ইচ্ছে হয়! চটকাতে ইচ্ছে হয়। কিরণদা থাকলে বাণীকে বুকে জড়িয়ে আদর সে না করেছে তা নয়। বাণী কাছে টেনে নিলেই ছটফট করত। দু-হাতে জড়িয়ে চুলের গন্ধ নিতে গেলে মাথা সরিয়ে ফেলত।

কেমন সুড়সুড়ি লাগে।

তোর কাঞ্চনদা। আমি যেমন, লজ্জা কী! যা। বোস পাশে। কী বলছে শোন।

কোন ক্লাসে পড়?

ফোর।

ফোর! বাঃ সুন্দর। ক্লাস ফোর। কোন স্কুলে পড়?

রামমণি প্রাথমিক বিদ্যালয়।

রামমণি বানান?

বাণী রামমণি বানান সহজেই বলে ফেলায় সে খুশি। যেন এতে বাণীর উপর আরও সব আবদার করার সুযোগ তার বেড়ে গেল। সেই প্রথম কিরণদা তাকে বাড়ি নিয়ে এসেছিল। ছোড়দির প্রেস থেকে বের হলে বলেছিল, চল আমার বাড়ি ঘুরে যাবি।

বাড়িতে ঢুকেই ডেকেছিল, বড়দি, শিগগির আয়। দ্যাখ কে এসেছে!

ছুটে লাফিয়ে যে ঢুকল তাকে দেখে কাঞ্চন হতভম্ব।

আমার বড়দি। বাণীপ্রিয়া। তোরও বড়দি। বড়দি বলে না ডাকলে তার সাড়া পাবি না। সে অন্ধকারে ঘাপটি মেরে বসে থাকবে।

কাঞ্চন অবশ্য কোনওদিনই বড়দি বলে ডাকেনি। বাণী কোথায়? বললেই দরজার ফাঁকে মুখ। মুখ ভরা হাসি। বাণী তাকে পছন্দ করে। বড়দি না ডাকলেও তার সাড়া পাওয়া যেত।

এসো না!

বাণী দরজা ধীরে ধীরে খুলতে থাকে।

কিছুটা আবির্ভাবের মতো—এক ঝটকায় দরজা খুলে ফেললে বাণী যেন খুবই সহজলভ্য হয়ে যাবে। সে খুব আস্তে দরজা খুলে পা টিপে তার কোলের উপর এসে ঝাঁপিয়ে পড়ত।

বছর চারেক হয়ে গেল। বাণী এখন কোন ক্লাসে পড়ে বললে রাগ করে। বারে, প্রায়ই আসো, জানবে না, কোন ক্লাসে পড়ি। তুমি সব এত ভুলে যাও। বাণীর গুরুত্ব তার কাছে কমে গেলে সে তো রাগ করবেই। চার বছর আগে ক্লাস ফোরে পড়লে এখন কোন ক্লাস হয় বোঝো না। তোমাকে মনে করিয়ে দিতে হবে।

এখন অবশ্য আর ছুটে তার কোলে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে না। বাণীও শেষ পর্যন্ত কি

বড় হয়ে গেল ! বড় হয়ে গেলে লজ্জা হয় । হাত ধরে থাকলে পাপ কিংবা গোপন সম্পর্ক তৈরি হচ্ছে, কেউ দেখলে ভাবতে পারে ।

বাণীকে এ-জন্যই আরও বেশি ভাল লাগে ।

ভাল লাগলে হবে কী, বাণী তো আর থাকছে না । সব বুঝতে শিখলেই দিদিরা হয়তো তাকেও নিয়ে আশ্রমে তুলবে । তাকে আর সে দেখতে পাবে না । বিছানায় পুরুষের সঙ্গে শোওয়াটা তাদের বোধহয় পছন্দ নয় ।

নলিনীর তাড়া খাবার পর, বাণীকে এক পলক দেখার প্রলোভনেই কি সে এখানে চলে এসেছে । চাঁপাফুলের উপমা দিয়ে কি বুঝিয়ে দিচ্ছে তার এখন ফোটার বয়স । হাত ধরে রাখলে তার ফোটায় বিঘ্ন ঘটবে । ফুল না ফুটলে গন্ধ ছড়ায় না । সুঘ্রাণ উড়ে বেড়ায় না বাতাসে । বাণীপ্রিয়া বোধহয় টের পেয়ে গেছে ।

এখন হয়তো বাণী বললেও রাগ করতে পারে ।

না বাণী না, বাণীপ্রিয়া । আমার নাম বাণীপ্রিয়া ।

বাণীপ্রিয়া নামটি তারও পছন্দ । আজকাল মেয়েদের নামে আধুনিকতার গন্ধ না থাকলে, মেয়েরা নিজের নাম বলতেও লজ্জা পায় । বাণীপ্রিয়া তো সেই কবেকার কথার মতো—অতীত স্মৃতি থেকে নামটি ধার করা হয়েছে । বাণীর তাতে কোনও আপত্তি নেই—বরং এই নামেই সে খুশি । বাণীপ্রিয়া ডাকলে ছলাত করে মুখ রক্তাভ হয়ে ওঠে ।

তবু তাকে খেতে বলায় সে বড়ই কুণ্ঠিত । সে এসে উটকো ঝামেলা সৃষ্টি করেছে । নিজের ভিতরে গুটিয়ে গেছে অনেকটা । শামুকের খোলে ঢুকে গেলে যা হয়—প্রকৃতির বিরূপতা সে সহ্য করতে পারে না । সে দেখতে পায়, মাসিমা সে খাবে বলে খুবই ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন । এতবার এসেও সে কেন যে ভাবে, মাসিমা তার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লে নির্যাতনের সামিল । খোলের মধ্যে গুটিয়ে গেলে—কিছুই চোখে পড়বে না ।

একটা শামুক নিশ্চল হয়ে পড়ে আছে যেন ।

এটা যে কী করল বাণীপ্রিয়া । তাকে সময়ও দিল না । বলেই ছুটে গেছে । তুমি দুপুরে খাবে । ইচ্ছে করলে সে পালাতে পারে । বারান্দায় সাইকেল—এত বড় বাড়ি থেকে, কেউ চুপি চুপি অনায়াসে বের হয়ে গেলে টের পাবার কথা না । কিরণদাও কিছু মনে করবে না ।

ও ওরকমেরই । না খেয়ে পালিয়েছে—কী রে বড়দি, ওকে ধরে রাখতে পারলি না । কখন এল ! কখন চলে গেল !

বাণীকে ছোট করা হবে । বাণীর অবহেলাতেই সে পালাবার সুযোগ পেয়েছে । কখন এল, কখন পালাল বললে বাণী ঠিক ঠোঁট উল্টে বলবে, কী জানি । তোমার বন্ধুর মাথা ঠিক নেই জান ! বাণীর কাছে ছোট হওয়া যায় না । আর বাণীকে যখন পাওয়া গেছে সময়ও কেটে যাবে । যাবার সময় বাণী দরজার পাশে ঠিক দাঁড়িয়ে থাকবে । হাতের কাছে, জলের গ্লাস, নুন এগিয়ে দিলেও বাণীকে সে দেখতে পাবে । এই একটা লোভ । বাণী কাছাকাছি আছে । না খেলেও তার ক্ষতি নেই । সে বাড়িটায় টানা ঘন্টার পর ঘন্টা পড়ে থাকবে—এই বাসস্থানের কোনও গৃহে বাণী স্নান করছে, চুল আঁচড়াচ্ছে, ফ্রক গায়ে দিচ্ছে, কিংবা তার হাঁটা চলা, সবই সে শামুকের খোলে ঢুকে গেলেও টের পাবে । তার তো বিশাল সাম্রাজ্য—প্রকৃতির চতুষ্পার্শ্বে পোকামাকড়, কীট-পতঙ্গ, কখনও সূর্য কিরণে উদ্ভাসিত শালবনের শাখাপ্রশাখা—রেলগাড়ি ছুটছে—ঝিক ঝিক শব্দমালা—সে গাছের গুঁড়িতে কিংবা জলজ ঘাসে খালের অন্ধকারে আঁতিপাঁতি করে খুঁজছে কোনও মেয়ের

নিঃশব্দ এক বিচরণ। ঘর অন্ধকার করে সে শুয়ে আছে। দরজায় শব্দ হলে, শামুকের খোল থেকে বের হয়ে বিন্দুমাত্র তাকাবে—তার বেশি না।

স্নান করবে না।

সে চোখ খুলে দেখল, বাণী দরজায়। ভিজে চুল থেকে জল শুষে নেবার জন্য শুকনো তোয়ালে জড়ানো। সে তাড়াতাড়ি উঠে বসতেই চুলে জড়ানো তোয়ালেটা ওর হাতে ধরিয়ে দিল।

স্নান! একদিন স্নান না করলে কি খুব ক্ষতি হবে বলছ বাণীপ্রিয়া?

স্নান না করে কেউ থাকতে পারে।

পারে না হয়তো। আমি তো ঠিক জানি না, স্নান না করলে আমার কতটা ক্ষতি হবে। ট্যাংকের জল সহ্য হয় না বাণী।

কল থেকে জল তুলে দিচ্ছি।

তুমি দেবে কেন? আমি নিজেই নিতে পারি। বশিষ্ঠদা নেই!

আছে। তবে পারবে না। অসুখ।

অসুখ কেন।

বাণী কী ভাবল কে জানে। ঠোঁট টিপে হাসল। সে কি খুবই বোকার মতো প্রশ্ন করেছে! আসলে সে কথার খেই পায় না। কথার পৃষ্ঠে কি কথা বলতে হয় সে হয়তো জানে না।

কাঞ্চন আসনপিঁড়ির মতো তক্তপোশে সোজা হয়ে বসে আছে। সে তার পাঞ্জাবি টানছে, পাজামা টানছে। শরীরের যতটা আবৃত থাকে—স্নান করলে পাজামা পাঞ্জাবির কী হবে। সে এ-বাড়ির বাইরের বাথরুমে স্নান করতে পারে। অসুবিধা থাকার কথা না। কিন্তু পাজামা পাঞ্জাবি খুলে ফেললে বাণী ঠিক বুঝবে কাঞ্চনদা শরীর খালি করে মগে মাথায় জল ঢালছে। সে মাথা মুছে বের হলেও বুঝতে অসুবিধা হবে না, কাঞ্চনদা বাথরুমে শরীর খালি করে দিয়েছিল। এই বোধটুকু খুবই হতাশ করে রাখে তাকে। সে লজ্জা পায়।

তার চেয়ে ভাল, বাড়ি থেকে স্নান করেই বের হয়েছি বলা।

কিন্তু এতক্ষণ পর বললে বিশ্বাস করবে কেন! একদিন স্নান না করলে কি খুব ক্ষতি হবে বলছ—এমন বলার পর আর বলা যায় না, সে স্নান সেরেই বের হয়েছে। তার আগেই বলা উচিত ছিল, এক বাক্যে যা শেষ হতে পারত, তা এখন নানা বাক্যের ঘোরপ্যাঁচে ফেলে দিয়েছে।

আমার শরীরটা ভাল না বাণীপ্রিয়া। জ্বর জ্বর লাগছে। স্নান করব না।

তবে মাথাটা ধুয়ে নাও। বলেই দৌড়ে গেল, বাথরুমে জলের বালতি রেখে ছুটে এল।

মাথা ধুয়ে গাটা মুছে ফেল।

শরীরে কি ঘামের গন্ধ পেয়েছে বাণী। গা মুছে ফেলতে বলল কেন। বাড়িতে মাসির কিংবা মার বকুনি, কী রে তুই গেঞ্জি ছেড়ে দিস না। ঘামের বোটকা গন্ধ। সহ্য করিস কী করে। তোর দেখছি কোনও ভেদভেদ নেই।

তুমি যখন বলছ, শরীর ভিজা গামছায় মুছে ফেলাই উচিত হবে। আমিও ঘামের গন্ধ পাচ্ছি। ভিজে গামছায় মুছলে শরীর ঠাণ্ডা থাকবে। কী বল বাণী!

তোয়ালেটা কাঞ্চন হাতে নিয়ে প্রায় ফাঁসির আসামির মতো উঠে দাঁড়াল। তার হাতে

তোয়ালে গছিয়ে বাণী আবার কোথায় ফেরার ! তোয়ালেটা সামান্য ভিজে। চুলের গন্ধ আছে তোয়ালের নীল নকশায়। সে দরজার দিকে সতর্ক চোখ তুলে নাকের কাছে তোয়ালেটা তুলতেই গন্ধ তেলের সুবাস পেল। এ তো বাণীর চুলের গন্ধ। সে গোপনে তোয়ালেটা নাকের কাছে চেপে ধরেছে। বাণী হয়তো জেনেই দিয়েছে। তার চুলের গন্ধ সে পছন্দ করে। কারণ বাণীর ক্লাস ফোরের জীবন এখনও চুলের গন্ধে থেকে গেছে কি যায়নি বোঝার জন্য দিতে পারে।

সে তোয়ালেটা নিয়ে ফের বসে পড়ল।

ভিতরের দিকের দরজা টেনে দিতে পারে। কিন্তু মুশকিল, দরজাটা ভেতর থেকেই খোলা যায় বন্ধ করা যায়। বাইরে থেকে শুধু টেনে দিতে পারে। বন্ধ করার অথবা শেকল তুলে দেবার কোনওই ব্যবস্থা নেই। ক্লাশ ফোরের জীবন চুলের গন্ধে থেকে গেছে কি যায়নি বোঝা খুব সহজ কাজ না। বরং বাথরুমে ঢুকে দরজা বন্ধ করে চেষ্টা করে দেখতে পারে। বার বার নাকের কাছে নিয়ে আশ্চর্য সুবাস পায়, সেই একই দামি গন্ধ তেলের ঘ্রাণ। এই তেল জলি মলি কি মাখত ! চুলের বাহার তেলটা মাখলে আশ্চর্য বিকাশ ঘটত মুখের। মুখশ্রী যাদের এত সুন্দর হয় ব্রহ্মচারিণী হলে কি তারা আর পুরুষের সঙ্গে শোওয়ার কথা সত্যি ভাবে না। কেউ কি বুঝতে চায়নি গন্ধটা। অথবা বুঝলেও তারা ধরা দিতে চায়নি—কিংবা এমনও হতে পারে, এই ঘ্রাণেই কোনও অন্য ব্যভিচারের কাতর স্পর্শ ঘটায়—শরীর দিয়ে তারা সায় দিতে পারেনি।

ব্রহ্মচারিণী আর পরিব্রাজিকার কী তফাত সে জানে না। কমলেশের বাড়িতে লাল পেড়ে সাদা শাড়ি আর চাদরে সেই গন্ধ তাদের আর নাও থাকতে পারে। গন্ধটা আজ বোঝার দরকার আছে। বাণী এই গন্ধ তার হাতে তুলে দিয়ে বোঝাতে চায়, সে কতটা বড় হয়েছে। ভিতরের বড় হওয়া আর বাইরের বড় হওয়া যে এক নয় তারও প্রমাণ এই সামান্য তোয়ালে— অতি তুচ্ছ বস্তু থেকে যে জীবনের নানা ঘোর সৃষ্টি হতে পারে কাঞ্চন তোয়ালেটা হাতে না নিলে যেন বুঝতে পারত না। আসলে সব মানুষেরই থাকে এই তুচ্ছ করার সখ এবং কোনও ঘোরের স্বপ্ন।

সে দেখল দরজায় ফের বাণীপ্রিয়া।

যাও। বসে থাকলে কেন ! বালতিতে জল আছে। মগও আছে। মাথাটা ভাল করে ধুয়ে গা মুছে ফেলবে।

কাঞ্চন বসে আছে দেখে বাণী কী ভাবল কে জানে। কাছে এগিয়ে আসছে। বালিকা কে বলবে ! গিন্নি-বান্নির মতো কথাবার্তা।

সত্যি জ্বর হয়েছে বলছ। দেখি।

এই রে। হাত বাড়িয়ে দিল বুঝি। গায়ে হাত দিয়ে দেখতে পারে। সে যে স্নান করার ভয়ে বলছে না—বাণী,কী করে বুঝবে।

কিছু বোঝবার আগেই বাণী তার কপালে হাত ঠেকিয়ে বলল, এ মা সত্যি দেখছি জ্বর। গরম গরম লাগছে। জ্বর গায়ে বের হয়ে পড়লে ! তুমি মানুষ, না অপদেবতা।

সে শঙ্কিত ছিল, বাণী, নলিনীর মতো অছিলা না খুঁজে বেড়ায়। নলিনীর অছিলার শেষ নেই। তাকে সাপ্টে পাটিসাপ্টার মতো তাড়িয়ে তাড়িয়ে খেতে চায়। কিন্তু সে পারে না। নলিনী বড় কম বয়সে পেকে গেছে সে জানে। সে আর নলিনী এক বিছানায়—মা পাশে। মাসির সঙ্গে ঘুমাব। মাসির বিছানায় ঘুমাব। কান্নাকাটি জুড়ে দিলেই মা বলত, শুতে যখন চায়, পাঠিয়ে দে। তোর রাতে ডিউটি—একা ঘরে ভয় তো করবেই।

তখন সে নিজেও একা আলাদা ঘরে শুতে ভয় পেত। পাশেই বড় রাস্তা গেছে, গঙ্গার দিকে। দিন রাত শব বাহকদের দল যাচ্ছে— দিনে রাতে দু'তিনটে শব হেলথ সেন্টারের পাশের রাস্তা ধরে শ্মশানে যাবেই। অঞ্চলের মহাশ্মশান বলে কথা। গঙ্গা পাইয়ে দেবার জন্য ভাড়া করা শব পোড়ার দল মাঝে মাঝে বটগাছের নীচে মরা রেখে হেলথ সেন্টারেও ঢুকে যেত। কল টিপে জল খেত। এত সব প্রেতাত্মার উপদ্রবের ভয়ে একা আলাদা ঘরে শুতে সাহস পেত না। নলিনীরও এই একই অজুহাত। আবদার মাসির সঙ্গে শোবে। সে তো তখন সেভেন এইটে পড়ে— নলিনী থ্রিতে পড়ে। অথচ এক রাতে চুপি চুপি হাত টেনে নিয়ে প্যান্ট আলগা করে দিল। লজ্জায় ঘৃণায় আতঙ্কে তার নিজেরও মরা মানুষ হয়ে যাওয়া ছাড়া উপায় ছিল না। যা খুশি কর। জ্যান্ত মানুষের ওটা হাত না। মরা মানুষের হাত। মরা মানুষের তো কাণ্ডজ্ঞান থাকে না। হাত ছুঁয়ে নিজে বুঝিস না! মরা হাত না জ্যান্ত হাত!

তুমি মানুষ! সকালে গোপনে হম্বিতম্বি নলিনীর।

কেন, কী হল!

ভেংচি কেটে বোঝালে নলিনী, তুমি অসভ্য ইতর। কিছু জান না। তারপর বলেছিল হাতটা তোমার না কার অন্ধকারে বুঝতে পারছিলাম না। কোনও সাড়া নেই। দেব একদিন হাত মটকে। তখন বুঝবে।

নলিনী, হাতটা আমার নয় রে।

কার হাত!

মরা মানুষের।

মিছে কথা। মরা মানুষের হাত ওটা নয়। মরা মানুষের হাত অত গরম থাকে না।

তার অবাক লাগত। নলিনী যেন তার চেয়ে বয়সে কত বড়! আরে তোর চুল ন্যাড়া করে দেয় মাসি। চুলের গোছ হবে বলে, পাঁচ সাত মাসও পার হয় না। বলির পাঁঠার মতো টেনে হিঁচড়ে ভজনদার ক্ষুরের নীচে ফেলে রাখে। তুই কাঁদিস, আর ছটফট করিস। জোর করে তোর মা ধরে রাখে— আর তুই কিনা, এত পেকে গেলি!

আসলে তার মনে হত সবই সার্কাস। চুলের গোছ তেজি হবে ভেবে মা তার কন্যাটিকে সম্ভোগের উপযোগী করে তুলছে। স্নো পাউডার গন্ধ তেল, লাল ফিতে, আয়না চিরুনি সব দিচ্ছে। কারণ রিঙের খেলা শুরু হলে যেন জানোয়ারটা চাবুকের বশ থাকে।

সে আতঙ্কে ছিল— বাণীও তদ্রূপ আচরণ করে বসবে কি না। না বাণী খুবই চিন্তিত। তার গা-টা ছ্যাঁক ছ্যাঁক করছে। চান করা ঠিক হবে না।

বললও তাই।

শরীর তোমার ছ্যাঁক ছ্যাঁক করছে। গরম লাগছে। মাকে গিয়ে বলি। কাঞ্চনদার শরীর ভাল নেই। গাটা গরম। চান-টান করবে না।

বলে বলল, দাও তোয়ালেটা ফিরিয়ে দাও।

তোয়ালেটা নিয়ে নিলে সে বুঝতেই পারবে না— ক্লাস ফোরের জীবন আর আছে কি নেই! বাণীপ্রিয়া তো চায় গন্ধ শুঁকে টের পাক কাঞ্চনদা, সে আর আগের বাণী নেই। সে টের না পেলে শেষে সেও না ফের রিঙের খেলা ছেড়ে তপোবনবাসিনী হয়ে যায়। অভিমান হতেই পারে। দোষ দেওয়া যায় না। সব মেয়েরাই পুরুষের সঙ্গে শুতে চায়। কিছু মেয়ে আছে তারা চায় না।

সে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল। পাছে তার হাতের তোয়ালে ছিনতাই হয়ে না যায়। বাথরুমে অনন্ত অবসর গন্ধ শুঁকে দেখার। বাথরুমে গেলে বাণীও খুশি থাকবে। কাঞ্চনদা পাজামা খুলছে।

মাথাটা ধুয়ে নিই, কী বল! ভিজে তোয়ালে দিয়ে শরীর মুছে নিলেও আরাম পাব মনে হয়। সে তোয়ালেটা ঘাড়ে ফেলে সোজা বাথরুমে ঢুকে গেল। বাণী অভিমানে তপোবনে চলে গেলে বাড়িটা তার কাছে একেবারেই অর্থহীন হয়ে যাবে। যতই গায়ে জ্বর থাকুক, বাণীর জন্যই বাথরুমে তার ঢোকা দরকার।

॥ ৫ ॥

কিরণ অফিস থেকে ফিরে সত্যি গোলমালে পড়ে গেল। বাড়ি ফিরতেই বাণী খবরটা দিয়েছিল।

দাদা তোমার বন্ধু পালিয়েছে।

তার বন্ধু! সে কে! পালিয়েছে মানে! কার কথা বলছে বাণী।

কিরণ নিজের ঘরে ঢুকে অফিসের জামা কাপড় ছাড়ার জন্য লুঙি কাঁধে সবে বাথরুমে ঢুকবে, ঠিক সেই সময়ে দরজায় বাণী।

বাণী এ-সময়টায় বাড়ি থাকে না। কোচিং-এ যায়। সন্ধ্যায় ফিরে আসে।

তুই পড়তে যাসনি?

পড়তে যাব কী? কাঞ্চনদা এসেছিল জানো। মা খেতে বলল দুপুরে—খেতে রাজিও হল। জল তোয়ালে দিলাম। গায়ে জ্বর বলে মাথা ধুয়ে বের হল। তারপর কাঞ্চনদা ফেরার। নেই, কোথাও নেই।

খেতে রাজি হয়েছিল বলছিস?

হ্যাঁ তাই তো বলল।

তার জন্য তোর পড়তে না যাওয়ার কী হল? ও তো ও রকমেরই।

বাণী ভাবল, দাদা না আবার কী মনে করছে! খায়নি— বেশ করেছে। কার এত দায় ছিল তাকে খাওয়ানোর জন্য এত সাধ্য সাধনার। সেই মাকে বলেছে, মা জানো, কাঞ্চনদার না মুখ শুকনো। কতদূর থেকে এসেছে। দাদা নেই, ঘরে হয়তো শুয়ে থাকবে।

দাদার ফিরতে বেলা পড়ে যাবে এও তার মনে হয়েছিল। কাঞ্চনদার মা সব সময় অসুস্থ— ঠিক নজর দিতে পারেন না। ছেলের মতিগতিও হয়তো বোঝেন না। হয়তো না বলেই বের হয়ে পড়েছে। এত সব ভেবেই বলা, মা কাঞ্চনদাকে খেতে বলি।

বল। ও আর কী খাবে! খেতে জানে!

সুতরাং দুপুরে মা খেতে বলেছে, অর্থাৎ সে-ই মাকে বলেছিল, মা, কাঞ্চনদাকে খেতে বলি! মা তাতে রাজি হয়েছে মাত্র, কাঞ্চনদাকে খাওয়ানোর ব্যাপারে সে-ই যে নাটের গুরু— মা বললে দাদা হয়তো জেনে ফেলবে। খেলে এত কৈফিয়ত দিতে হত না। কাঞ্চনদা না খেয়ে ফেরার হয়ে যাওয়ায় কিঞ্চিত সে অস্বস্তিতে ছিল। কী দরকার ছিল, খেতে বলার। ও কি ভাল মন্দ কিছু বোঝে! চাকরিটা নিল না। বার বার পরীক্ষা দেয়, ফেল করে— মেঘে মেঘে কত বেলা হয়েছে তাও বোঝে না।

রেগে গেলে কাঞ্চনদার বিরুদ্ধে দাদার অভিযোগের অন্ত থাকে না। সে পড়তে যায়নি

পাছে মার কাছ থেকে দাদা জেনে ফেলে, তারই অনুরোধে না [illegible]। মা যদি বলে দেয়। আমি কি করব! বাণী এসে বলল, জানো কাঞ্চনদা না শুকনো মুখে বসে আছে। খেতে বলি। সে যে না খেয়ে চলে যাবে জানব কী করে! তখন চোট সামলাতে হবে তাকে।

কিরণ আর জামকাপড় ছাড়তে বাথরুমে ঢুকল না। কোথায় যেতে পারে। শহরে এল, বাড়িতেও এল, অথচ না খেয়ে বের হয়ে গেল। আচ্ছা ছেলে মাইরি। অন্তত অফিসে ঢুঁ মারতে পারত। কোনও দরকারে এলে অফিসেও চলে যায়। তবে অফিসে ঢুকতে কাঞ্চন যে অস্বস্তি বোধ করে তার আচরণে কিরণ সেটা ধরতে পারে। এই বয়সে একজন বড়বাবু হওয়া সোজা কথা না। মেলা কন্ট্রাকটার তার দেখা পাওয়ার আশায় গেস্টরুমে বসে থাকে। কাঞ্চন দেখেছে, সে অফিসে খুবই ব্যস্ত মানুষ। তাকে সবাই তোয়াজও কম করে না। হেঁজি পেঁজি কেউ এলে অফিসের লোকদের রাগ হতেই পারে। একবার স্লিপ পাঠাতে পর্যন্ত হয়েছিল। সেই থেকে পারতপক্ষে কাঞ্চন আর তার অফিসে যায় না। নতুন আর্দালি, তাকে চেনেও না—নাম বললেই ঢুকতে দেবে কেন!

গেল কোথায়! বাড়ি ফিরে গেল! এই রোদে, সে বাড়ি ফিরে যাবে বিশ্বাস হয় না। আরও চার পাঁচটা ঠেক শহরে তার আছে। নিমতলার সুধাময় বাবুর ঘড়ির দোকান, দোকানে শহরের উঠতি লেখকদের মাঝে মাঝে আড্ডা জমে। কাঞ্চনকে সুধাময়বাবু পছন্দ করেন— তার মা সৌদামিনী দেবীর পারিবারিক কাগজটিতে, কিরণদাই দুটো কবিতা কাঞ্চনের আদায় করে দিয়েছে। যদি সেখানে যায়।

আর যেতে পারে সুধীনের বাসায়। সুধীনের পড়াশোনার খুব বাতিক। গল্প কবিতার সমজদার। কৃতী ছাত্র। তবে দুর্ভাগ্য, ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা দেবার পর কী হল কে জানে— পড়াশোনা ছেড়ে দিল। কবিতা লেখে আর কলকাতার কাগজে পাঠায়। ছাপা হয় না! আজকাল রাস্তায় সবসময় ঘোরে। সাহিত্য পাগল মানুষদের সে পছন্দ করে। বাড়ির ছোটছেলে, গঙ্গার ধারে বিশাল বাড়ি, বাপের খায়। বনের মোষ তাড়ায়। দাদারা সবাই কৃতী পুরুষ, ছোট ভাইটার জন্য তাদের কষ্ট হয়। তবে কেউ হ্যাটা করে না তাকে। তার নিজস্ব ঘরে সে কাউকে বসিয়ে যা হুকুম করবে বাড়ির ঠাকুর চাকরেরা শশব্যস্ত হয়ে তা তামিল করতে কোনও কসুর করে না। যদি রাস্তায় সুধীনের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়, কাঞ্চনকে বাড়ি নিয়ে যেতে পারে।

ছোড়দির বাসায় যেতে পারে। তার প্রেসেও। সকালে সীতেশই খবর দিয়ে গেছিল, ছোড়দি অসুস্থ। সারারাত বমি করে ভাসিয়েছে। ডোজ বেশি হলে হতে পারে। ছোড়দি খায়, তবে লিমিট রাখতে জানে। খুবই পরিমিত।

ঠিক আছে নিচ্ছি।

আর একটু নাও। ওষুধের ফোঁটা ফেলছ দেখছি।

না, না। এতেই হয়ে যাবে। বেশি খেলে মজা থাকে না।

তাদের অনুরোধ রক্ষার্থে কাজটি করে। দল বেঁধে কবিতা মেলায় কিংবা কোনও সাহিত্য অনুষ্ঠানেও ছোড়দি সবার সঙ্গে মানিয়ে চলতে জানে। এটাই বড় গুণ। বেশি মাত্রায় খাবার পাত্রী নয়। বরং হজম করতে পারবে কি না, কেউ ঢেলে দিলেও নিজে দেখে নেয় গ্লাস উঁচু করে। তারপর যতটুকু রাখা দরকার রেখে বাকিটুকু অন্য গ্লাসে ঢেলে দেয়। মাতাল হলে সে সবাইকে সামলাতেও জানে।

ইস কী করছে মেয়েটা!

চুপ, একদম মেয়েটা মেয়েটা করবেন না। আপনারা খান না। মাতাল হলে তো একজন সামলাবারও লোকের দরকার পড়তে পারে।

ছোড়দি নিজের ডোজ চেনে। সীতেশকেও বেশি খেতে দেয় না।

না আর খাবে না।

এইটুকু। লক্ষ্মী আমার।

কটমট করে তখন তাকাবে সীতেশের দিকে। তাকালেই হয়ে গেল।

না কিরণদা, আর না। অনেকটা পথ হেঁটে যেতে হবে। পারব না।

খুব পারবে। এইটুকু, দ্যাখ না। মেরে দে।

তুমি বোঝো না কিরণদা, ওর ছাত্রটাত্র সামনে পড়লে উপদেশ ঝাড়তে শুরু করবে। বেশি খেলেই হয়। বোঝে না স্যারের হয়ে গেছে। তা মাই ডিয়ার স্যার বলে যা খুশি তাই করতে পারে না। লজ্জায় মাথা কাটা যায়।

এই হারামজাদা, রাস্তায় কারও সঙ্গে কথা বলবি না। রিকশায় উঠে সোজা বাড়ি। কী মনে থাকবে।

আলবত থাকবে।

সেই মেয়ে বমি করে সারারাত ভাসিয়েছে। প্রেসেও আসেনি। প্রেস থেকে যদি খবর পায়, ছোড়দির শরীর ভাল না— প্রেসে আসেনি— সীতেশের বাড়িতে চলে যেতে কতক্ষণ।

ওকে আরও দরকার, কতটা এগোল। কতটা লিখেছে। আর তো সামনে দুটো মাসও সময় নেই। রাজিই করাতে পারছিল না। ছোড়দি মাথার দিব্যি দেওয়ায় বলেছে, চেষ্টা করব। তারপর বলেছে, কব্জিতে জোর না থাকলে হয় না। দুটো গল্প লিখেই টের পেয়েছি। যা কব্জির জোর আমার, কবিতা হলেও হতে পারে। গল্প উপন্যাস—বাব্বা! তুমি বোঝ না ছোড়দি, আমার মাকে নিয়ে কত আতঙ্ক। এই যায় যায়—আবার ভাল হয়ে যায়। অসুখটা যেন তামাসা করে জীবন নিয়ে। এই শ্বাস নিতে পারছে না। বুকে পিঠে তেল মালিশ, তারপরও যখন পারে না—টানাটানি, অক্সিজেনের কথা ভাবি, স্টেরয়েড গিলিয়ে দিই। ঘন্টাও পার হয় না। মিরাকল। কিন্তু ডাক্তার যে বলে বেশি স্টেরয়েড খাওয়া ভাল না। এত ত্রাস থাকলে লেখা হয়, বল। তারপর উপন্যাস। উপন্যাস লেখা কি চাট্টিখানি কথা। আমাকে বাদ দাও।

ছোড়দি ওর দিকে অপলক তাকিয়ে ছিল।

কিছু বলবে বোধহয়।

তারপর দুম করে বলে ফেলল, আমাদের কাউকে লিখতেই হবে। এটা একটা সুযোগ। হোক না সিনেমার কাগজ—উপন্যাসটা প্রথম তিনজনের মধ্যে থাকলে কী হবে বল তো। পুরস্কার, সঙ্গে টাকা—তারপর বই। মচ্ছব বলতে পারিস। এটা সবার ইজ্জতের প্রশ্ন, বুঝিস!

সীতেশদা পারবে। ওর কব্জির জোর আছে।

কী করে বুঝলি।

আর রা নেই।

কিরণ বলেছিল, তুমি কিছু বোঝ না, কী ভেবে বলেছে! ছোড়দিকে সামলাতে পারে আর একটা উপন্যাস লিখতে পারবে না। খুব পারবে।

মারব কিরণদা। ওর এত স্পর্ধা আছে, ভাবতে পারে কখনও? মগজে তো নানা

পোকামাকড়ের বাসা। কামড়ায়। কামড়ায় বলে কবিতা লেখে। না হলে তাও লিখত না। এত টিমিড। ওকে কোথাও নিয়ে গিয়ে সুখ আছে, বল? বড্ড পিতপিতে স্বভাব।

কাঞ্চন, ছোড়দি খেপে আছে রে। সামলা।

খেপে যাব কী। পরীক্ষার টেবিলে বসলে সে নাকি সব ভুলে যায়। কিছুতেই মনে করতে পারে না। শামুকের খোলের উপর কেউ শুনেছ পরীক্ষার খাতায় পাতার পর পাতা ভরাতে। প্রশ্নপত্র পড়তে পড়তে কেবল ওর নাকি মনে পড়ছিল—শামুকের খোলে সে লুকিয়ে আছে। ওর ভিতর থেকে বেরই হতে পারছে না। শামুক জলেও থাকে, ডাঙায়ও থাকে। শামুকের জগৎ বড়ই শান্ত। কোনও তরঙ্গমালা পৌঁছায় না। জলজ ঘাসে লুকোচুরি করে বেড়ায় নিতান্ত প্রাণের দায়ে। ডাঙার চষা জমিতে ফালের ডগায় উঠে আসে শামুক। পড়ে থাকে। জল থেকে ডাঙায় এল কী করে, শামুক কি তার উত্তর দিতে পারে? আরও হিজিবিজি—শুনে না মাথাটা দপ করে জ্বলে উঠেছিল। সত্যি বলছি, না বলে পারিনি—গর্ধব কোথাকার! পরীক্ষা দিস কেন? কে তোকে পরীক্ষায় বার বার বসতে বলছে। তোর লজ্জা করে না।

আমার বাবা যে প্রাইমারি ইস্কুলের মাস্টার। বড় স্বপ্ন ছিল তাঁর, আমি ছোড়দি গ্র্যাজুয়েট হয়ে হাইস্কুলে পড়াব। মাও স্বপ্ন দেখেন। পরীক্ষা না দিলে, তাঁরা কষ্ট পান।

এরপর আর কী কথা থাকতে পারে। ছোড়দি না বলে পারেনি, সবার তো সব হয় না। তোর যা আছে, তাই নিয়ে লেগে পড়। এত বড় চানস্ মিস করা ঠিক হবে না। আমার মাথার দিব্যি রইল।

তা কিছু লিখল। পাতা দশেকের মতো লিখেছে। দশ পাতা লেখার পর বলেছে, আরও কি লেখার দরকার আছে। দশ পাতায় উপন্যাস হয় না?

মারব গালে থাপ্পড়। ইয়ার্কি হচ্ছে!

না মানে কী নিয়ে লিখব ভাবছি। বার বার হেরম্ব সাধু মাথায় এসে গোলমাল পাকিয়ে দিচ্ছে।

হেরম্ব সাধু আবার কে!

আমাদের পাশের কোয়ার্টারে থাকে। মা তো বলে বর না ছাই। বউকে ধরে পেটায়—বর আমার রে! মা তেড়ে গেলে বলে, না দিদি, আমি তো মারছি না। আদ্যা স্তোত্র পাঠ করছি। জিজ্ঞেস করুন না আপনার বোনকে।

একেবারে অমানুষ!

ছোড়দি তুমি অমানুষ বলছ, আর বোলো না। গুপ্তবিদ্যা জানে। ইস্টিশানের বটগাছটা দেখেছ। ওখানে মন্দির করছে হেরম্ব সাধু। আমাদের গাঁয়ের চট্টরাজমশাই চাঁদা তুলে মন্দির তৈরির পরিকল্পনা করেছে। সে হাঁটলে চেলা চামুণ্ডারা হাঁটে—সে থামলে তারা থামে। মাঝে মাঝে দেবী ভর করেন। ঢাক বাজে। অমাবস্যা পূর্ণিমায় ইস্টিশানে মেলা বসে যায়। আজগুবি ঘটনা। ললাটলিখন পড়তে জানে। হত্যে দিয়ে পড়ে থাকে বাবার দর্শনের অপেক্ষায়।

আগে বলিসনি তো। তোকে নিয়ে না হয় যেতাম। তোর ললাটলিখন পড়িয়ে আনা যেত।

সে তো রোজই আমার ললাট দেখে। কিছু বলে না তো, ছোড়দি। গিয়ে কী করবে। বোধ হয় বুঝেছে, ললাট আমার গড়ের মাঠ। ঘাস ছাড়া মাথায় আর কিছু গজাবে না।

আসলে হেরম্ব সাধুকে নিয়ে সে এখন ভাবে। দিন দিন লোকটা ব্যস্ত হয়ে উঠছে। সকালে মা যদি ওর কাছেই যায়। কবে যেন পূজন মাসিকেও বলেছিল, হেরম্ব অনেক কিছু জানে।

এই অনেক কিছু জানে কথাটা মন্দ না। শুনতেও ভাল লাগে। লোকটা যে মানুষের দুর্বলতার সুযোগ নিচ্ছে বুঝতে অসুবিধা হয় না। নয়তো চট্টরাজমশাই হেরম্ব সাধুকে দেখলে হাতজোড় করে কথা বলে! অনেক কিছু জানে বলেই করে। গর্ভধারিণীর গর্ভপাত করাতে পারে। বশীকরণ কবচ দিতে পারে। একবার তো বিধুশেখরের বউকে বত্রিশটা বেলপাতায় কী সব ছক কেটে চুলে বেঁধে দিয়ে এল। ইস্কুলের পণ্ডিত, হেলথ সেন্টার তার দু চোখের বিষ। পেট ফোলা বউদের গরুর গাড়ি চাপিয়ে ডাক্তারের সামনে উদোম করে ফেলে রাখা খুবই অশালীন ঘটনা। দুই পক্ষ গত, তৃতীয় পক্ষ গর্ভবতী—গাঁয়ের ধাইমা নাজেহাল—কোঁথ দিচ্ছে, ব্যথায় হালুম হলুম—পণ্ডিতমশাই ছুটে এসেছিল হেলথ সেন্টারে। ধুতি পরনে, পায়ে কেডস—আর গলাবন্ধ কালো কোট। দশাসই চেহারার মানুষ। ভাঁটার মতো চোখ। তৃতীয় পক্ষ বলতে গেলে অপ্রাপ্তবয়স্কা।

এসেই ডাকাডাকি—হেরম্ব সাধু। ও হেরম্ব সাধু। পরিবার যে হেঁচকি তুলছে। শিগগির।

হেরম্ব সাধু হেলথ সেন্টারের মুখে রোজই একবার পেচ্ছাপ করে। এ-হেন হেরম্ব সাধুর শরণাপন্ন হওয়ায়, দু-পক্ষই খুশি। বত্রিশটি বেলপাতায় কী সব তন্ত্র মন্ত্র আর ছক কেটে হাতে দিয়ে আর একবার হাসপাতালের মুখে পেচ্ছাপ।

যান। চুল বেঁধে দিন। নেমে আসবে।

যথাসময়ে নেমে এসেছিল বলে, সন্তানটির নাম কেশব হয়ে যায়।

নামকরণ হেরম্ব সাধুরই।

কেশ থেকে জন্ম।

সুতরাং কেশব নাম রাখা হোক।

পণ্ডিতমশাইও খুশি। কেশ থেকে জন্মালে কেশব হয় কি না জানে না, তবে নামটি খুব পছন্দ। বিষ্ণু অবতার তার তৃতীয় পক্ষের গর্ভে জন্মেছে। তার করকুষ্ঠি করাতে গিয়ে হেরম্ব সাধু লিখেছিল—জাতকের অপমৃত্যুর আশঙ্কা আছে।

অপমৃত্যুর আশঙ্কা থেকে আত্মরক্ষার উপায় হেরম্ব সাধুই বাতলে দিয়েছিল। দীর্ঘায়ু কবচ পরিয়ে দিয়েছে। পুত্রটি এখন স্কুলে যায়। পণ্ডিতমশাই যিনি রাজনীতি থেকে ধর্মনীতি এবং দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণের নানাবিধ ব্যাখ্যা দেন—লোক পেলেই যিনি কত জানেন—ধর্মজ্ঞ, শাস্ত্রজ্ঞ মানুষটিও কাহিল হেরম্ব সাধুকে দেখলে।

আসলে প্রতাপ বাড়ছে।

এ-সব লিখে ফেলা যায়।

আসলে গল্পটা হেরম্ব সাধুকে দিয়ে শুরু।

কিন্তু দশ পাতা লেখার পর এগোয় না। কুৎসিত একটা লোক তার গল্পের নায়ক হবে, এটা সে এখন ভাবতে পারছে না। হেরম্ব যে একদিন মন্দিরের সেবাইত হয়ে যেতে পারে, বাবাঠাকুরও হয়ে যেতে পারে, গাঁয়ের মানুষজনের কথাবার্তা থেকে সে টের পায়।

অবশ্য গল্পে হেরম্ব সাধু নামটা সে রাখেনি। গল্পে নারান ঠাকুর নাম দিয়েছে। হেরম্ব যদি টের পায় তাকে নিয়ে কেচ্ছায় মেতেছে লীলার পুত্রটি, তবে মাকে আতঙ্কে ফেলে দিতে পারে। সকালে উঠেই হাঁচি কাশি থেকে একটা কাকের উপদ্রব—কা কা ডাক, সব

কিছুর কুডাক যা শুনতে পেলেই, ও হেরম্ব, সকালে ঘুম থেকে উঠে কোন পাখি দেখলে শুভ। একটা কাক আমাকে সকাল বেলাতে ঠোকরাতে এল।

ভাল লক্ষণ না দিদি। কাকটা পাতিকাক, না দাঁড়কাক।

পাতিকাক।

খুব খারাপ না। আবার ভালও না। ঠিক আছে ভাববেন না। কাক আর তেড়ে আসবে না। দেখলে পালাবে।

কাকগুলি মাকে দেখলেই পালায়। হুস করতে হয় না। এত যে গুপ্তবিদ্যার অধিকারী তাকে চটানো যায় না।

দশ পাতার মধ্যে নারান ঠাকুরের এমন সব অনেক কুকীর্তির কথা আছে। কিরণ, ছোড়দি, সীতেশের তাড়া খেয়ে না লিখে পারেনি। তখনই হাসি হাসি মুখে অভ্যর্থনা। ও মা, ছোড়দি, সীতেশদা, কিরণদারা এসছে। কেন এসছে জানে বলেই, বারান্দায় উঠে আসতেই বলেছিল, হয়ে গেছে।

ছোড়দি পেছনে।

কী হয়ে গেছে ?

আজ্ঞে তোমার উপন্যাস।

কমপ্লিট !

কমপ্লিট।

সাবাস কাঞ্চন। মাসিমা কোথায়। তাঁকে প্রণাম করা দরকার।

কাঞ্চন জানে, ছোড়দি তার প্রণাম-টনাম একদম পছন্দ করে না। সেই ছোড়দি মাকে খুঁজছে। প্রণাম করবে বলে খুঁজছে। সেও কম বিস্মিত হয়নি।

মাকে প্রণাম করা কি খুবই জরুরি !

আরে তিনি তোর গর্ভধারিণী বুঝিস না। তিনি না থাকলে তোকে পেতাম কোথায় ! তোকে তো আর প্রণাম করতে পারি না। পক্ষকালের মধ্যে তোর উপন্যাস শেষ ! ভাবা যায় !

মাসিমা বের হয়ে বলেছিলেন, ওমা তোমরা ! কিসে এলে।

রিকশায়।

বোসো। যাও ভেতরে যাও।

ছোড়দি বলেছিল, হতভাগাটা আপনাকে খুব জ্বালায়, না মাসিমা !

ও সেই ছেলে ! জ্বালাবে ! জ্বালালেও সুখ পেতাম। কোনও সুখ নেই আমার। সারাক্ষণ নিজের ঘর ছাড়া কিছু চেনে ! বিকেলে শালের জঙ্গলে ঘুরে বেড়ায়। কীটপতঙ্গ দেখে বেড়ায়। না হয় গঙ্গার ধারে গিয়ে বসে থাকে। নদী দেখতে তার ভাল লাগে। নদীর পাড়ে বসে থাকলে তার নাকি পরমায়ু বাড়ে, বোঝো ! এই ছেলেকে নিয়ে আমি কী করব !

তার বলার ইচ্ছে হয়েছিল, আর বছর বছর ফেল মারে। এতে মাসিমা দুঃখ পেতে পারেন। এমনিতে নানা অভিযোগ—কিরণ তোমরা ওকে বোঝাও। ছাইপাঁশ লিখে কিছু হয় না। দিনরাত কী ভাবে বল তো ! ছাইপাশ সব পত্রিকা পড়ে, গল্প কবিতা পড়ে দিন যাবে ! বল তোমরা ! আর হঠাৎ হঠাৎ চিৎকার—মা, মা !

বুক ধড়ফড় করে ওঠে।

শোনো।

কী শুনব !

দারুণ কবিতা। আহা আমি যদি পারতাম। মা শোনো।

না। আমার শোনার সময় নেই। কবিতা শুনলে পেট ভরবে না।

আমি তখন আঠারো বছরের যুবতী/ স্তনে গ্রীবায় উপুড় হয়ে আকাশ/ নক্ষত্রমালা কাটাকুটি করছে নানা ছক/ আমি তখন আঠারো বছরের যুবতী।

ছিঃ ছিঃ, এই তোদের কবিতার ছিরি। আঁতুরঘরে বিষ ছিল না। তোরা কী রে !

মা ! তারপর কী লিখেছেন—শোনো না। ধোয়া জলে, তুলসীপাতা ভাসে/ চন্দনচর্চিত মুখ/ ছবি হয়ে থাকি দর্পণে—তারপর দিন যায়, পলতেয় আগুন ধরে যায়/ জ্বলে—জ্বলে—জ্বলে/ জ্বলতে জ্বলতে পলতে শেষ হয়/ তলানিতে জমা কিছু নিশ্বাসের বুদবুদ/ তাও শেষে বায়ুমণ্ডল শুষে নেয়/ আমি আর থাকি না আঠারো বছরে/ ধোয়া জলে তুলসীপাতা ভাসে।

কবিতা পড়ে তোর দিন যাবে বাবা !

কবিতা !

কাঞ্চন চেয়ে থাকে, মাকে দেখে। মুখখানি তার শুকনো। চুলে পাক ধরেছে।

আচ্ছা এই কবিতাটা শোনো—প্লিজ। সেই কথাটাই একটুখানি অন্যভাবে বলতে চাই ; বলব যদি অন্যরকম শব্দাবলীর নাগাল পাই/ পাইনি বলেই দেখছি এখন/ মাঘের রাত্রে আকাশটার/ বুকের মধ্যে জমাট বাঁধে স্তব্ধ বিশাল অন্ধকার।

বলো কিরণ, এই কবিতায় জীবনের কিছু হয় !

মাসিমা আপনার এত স্মৃতিশক্তি ! ও পড়ল আর আপনি জপতপের মতো মনে রেখে দিয়েছেন। কিছু না থাকলে মনে রাখা যায়, বলুন ! যাকগে মাসিমা, আমরা কিন্তু দুপুরে খাব।

তোমরা সত্যিই খাবে !

না খেয়ে উপায় কী ! এই ছোড়দি, তুমি তো ও কতটা এগোল জানতে এসেছিলে। উপন্যাসটা শেষ। সবটা শোনা দরকার, কী বল !

ছোড়দি, সীতেশ এতটা আশাই করেনি। মন দু'জনেরই ভারী প্রসন্ন। দরকারে শুনতে শুনতে রাত কাবারও করে দিতে পারে। শুধু তো শোনা নয়। চরিত্রের স্বাভাবিকতা রক্ষা পেল কি না, উপন্যাসটা নিজে থেকে গড়ে উঠেছে, না মোটিভেটেড লেখা হয়ে গেছে—মোটিভেটেড হলে উপন্যাস দুর্বল হতে বাধ্য। অথবা উপন্যাসের গদ্যরীতি, কিংবা অনুভূতিমালা কতটা গভীর, চরিত্রগুলি প্রতিষ্ঠা করতে পারল কি না, সারা বাংলা প্রতিযোগিতা—পাঁচজন নামী লেখক বিচারক, তাঁরা পড়ে প্রথম রায়টি দেবেন বলেই অবশ্য শোনা দরকার।

কাঞ্চন কোথায় !

এত কথা হচ্ছে সে-ই নেই।

এই কাঞ্চন ! কাঞ্চন !

আজ্ঞে যাই।

ঘরে বসিয়ে কোথায় হাওয়া হয়ে গেলি। আমরা এ-বেলা থাকছি। মাসিমা আমাদের চা পাঠিয়ে দেবেন। আপাতত এক রাউন্ড চা হয়ে যাক। কী সীতেশ, দাঁড়িয়ে থাকলি কেন ! বোস।

যেন কিরণদা আর ছোড়দিরই এটা বাড়ি। কাঞ্চন এ-বাড়ির কেউ না। সে কাউকে

বলতেও বলছে না। কথার কথা তো ভাবতেই পারে না। তোতার মতো ফাঁক পেয়েছে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। মুখ লজ্জার। স্নিগ্ধ আলপনা।

আগে থেকেই কথা ছিল, মাঝে মাঝে শুনে যাবে। ঠিকমতো এগোচ্ছে কি না তারা শুনে রায় দিলেই লেখা শুরু করবে। উপন্যাসের সে কিছু বোঝে না। এই কারণেই সে উপন্যাস লিখতে রাজি হয়েছে। এটা তাদের পয়লা দফা। আর এসেই যা শুনল—অবাক, উপন্যাস শেষ।

একটা আশা তো তার ছিলই—তবে দুশ্চিন্তা ছিল, শুরুই করেছে কি না। শঙ্করকালের উপর কাঞ্চনের আস্থা নেই। উত্তেজনা থেকে দিয়েই ছুটে এসেছে।

গল্প এক পাতাতেই, দুটো গল্প লেখা যেতেই পারে কিরণদা। তাই বলে উপন্যাস! জানিই না, কীভাবে এগোতে হয়।

উপন্যাসও কম পড়িসনি। এত যখন পড়েছিস, একটা উপন্যাস লেখাও সোজা।

না, সোজা না দাদা। ভয় করছে। আচ্ছা আগে কি কাঠামো ঠিক করে নেব!

ঠিক করে নেওয়াই মনে হয় উচিত। কিরণদা তোমার কী মত!

না ছোড়দি, কাঠামো ঠিক করে নিলে, চরিত্র দুর্বল হয়ে পড়বে। কাহিনী জোর পেতে পারে। কিন্তু রিয়্যালিটি-এর অভাব থাকবে। দুমদাম ঘটনা ঘটবে। কোনও কার্যকারণের ধার ধারবে না। থিমেটিক লেখায় লেখকের স্বাধীনতা থাকে না।

কিরণদা তুমি কী চাও বুঝি না। কাঠামো ঠিক করে না দিলে হয়। মিঠু ঠিকই বলেছে—একটা বিষয় বেছে নিতে হবে। কাঠামো ঠিক করে নিতে হবে।

না সীতেশ। এই ফর্মুলার লেখক আমাদের সাহিত্যে অনেক আছেন। বাজার কাটতি হতে পারে—স্থায়ী দাগ রেখে যেতে পারে না।

শোষণের উপর লিখতে হয় না কিরণদা!

দ্যাখ কাঞ্চন, শোষণ নেই কোথায়। এই যে সব প্রগতিশীল লেখক বলে যারা ধ্বজা উড়িয়ে বেড়ান—ড্রইংরুমে বসে, বিহার মধ্যপ্রদেশের আদিবাসী জীবন নিয়ে জোতদার ব্রাহ্মণবাদের বিরুদ্ধে রচনা লেখেন, তারাও শোষক—তবে এদের আমি ছদ্মবেশী শোষক মনে করি। আজকাল তো প্রগতিশীল সাহিত্যের নামে কিছু লেখক ধ্বজা উড়িয়ে বেড়াচ্ছেন। আসলে পয়সা কামাবার ধান্দা। টাকাও হল, প্রগতিশীলতাও বজায় থাকল। বস্তেড লেখার বইটির বিশাল সরকারি ভ্যালিউমটি ঘরে থাকলে, জোতদারের কেচ্ছা লেখা কত সহজ বল! মানুষ, মানুষ। জোতদারই হোক, জমাদারই হোক, জীবন একটাই—জোতদার হলেই তিনি মন্দ মানুষ হবেন, আর জমাদার হলেই ভালমানুষ হবে তার কোনও কথা নেই। যে খুন করে, তার খুনের দিকটাই বড় না। কোন পরিস্থিতিতে খুন—খুনের আগেকার সময়ে তার রক্তে যে অন্তর্গত খেলা—তার কথা লিখলেই মানুষটাকে মানুষ হিসাবে বিচার করা যায়। কী, মিছে কথা বললাম!

ঠিকই। তবে একজন পাপী লোক তো উপন্যাসে মহৎ চরিত্র হতে পারে না কিরণদা।

দ্যাখ শিল্পীর কাছে কেউ পাপী নয়, সব সময় সে মানুষের কথা লেখে। তার কাছে খারাপ ভাল মানুষ বলে কিছু নেই। লেখায় প্রসাদগুণ হল আসল কথা। কী ছোড়দি, চুপ করে আছ কেন। ঈশ্বরের সৃষ্টিতে কি কোনও দাগ থাকে!

তা হলে শুরু করে দিই। ছোড়দি যখন বলছে, আমি পারব, শুরু করে দেওয়াই ভাল না কিরণদা!

শুধু শুরু করে দেয়নি কাঞ্চন, শেষও করেছে। এর চেয়ে সুখবর আর কী থাকতে পারে।

তোমরা ঠিক হয়ে বোসো। এই সীতেশ জুতো খুলে তক্তপোশে উঠে যা। জানালা খুলে দে। ছোড়দি তুমি দেয়ালে হেলান দিয়ে বোসো। এই তো মাসিমা, আরে আপনি আসতে গেলেন কেন, ছোড়দি তুমি যাও মাসিমাকে হেলপ কর। কাঞ্চন কী করছে!

রান্নাঘরে বসে আছে।

রান্নাঘরে কী কাজ!

কী জানি বাবা কী কাজ, কেবল বলছে, ছোড়দিরা এল—কী রান্না করবে মা! বাজার থেকে একটু ঘুরে এলে হত না।

ওকে বলুন তো রান্নাঘরে বসে না থেকে এখানে যেন চলে আসে।

সীতেশই তক্তপোশ থেকে নেমে দরজা পার হয়ে গেল। ছোট্ট উঠোন, দু-তিনটে পেঁপে গাছ, করবী ফুলের গাছও আছে একটা। তারপর দেয়াল। দেয়ালের ও-পাশে চা মুড়ি মুড়কির দোকান। কাঞ্চন দেয়ালে হাত গলিয়ে একটা ঠোঙা তুলে আনছে।

কী করছিস এখানে। যা কিরণদা ডাকছে।

কিছু মুখে না দিয়েই বসবে। মুড়ি, নাড়ু, দুধ খাবে? চা তো পূজনমাসি করে দিয়েছে। যাতে অসুবিধা না হয় দেখছি।

আমাদের অসুবিধা তোকে দেখতে হবে না। তুই যা ভিতরে।

কিরণদা আমাকে তুমি ডাকছ!

সে কাঞ্চনকে দেখছিল। আশ্চর্য ছেলে তো। এমনভাবে বলছে, যেন কিরণদা তাকে কিছুতেই ডাকতে পারে না। তার মেলা কাজ। এক ফাঁকে কিরণদার সঙ্গে দেখা করে গেল।

রান্নাঘরে বসে আছিস কেন!

জানো, ভাল পাবদা মাছ বাজারে ওঠে। একটু ঘুরে আসছি। নদীর মাছ। খুব সুস্বাদু। সাইকেলে যাব আর আসব। ওই তো বাসস্ট্যান্ডের কাছে।

পাবদা মাছ খাওয়ানো কি খুবই জরুরি।

মা যে বলছে, বাজার থেকে ঘুরে আসতে। বেগুন দিয়ে আদা জিরের ঝোল। কাঁচালঙ্কা কালোজিরে ফোড়নে। খুব সুস্বাদু নাকি খেতে। যেই আসে, লীলাদি পাবদা মাছ। মারও ইচ্ছে পাবদা মাছ তোমাদের খাওয়ায়।

দাঁড়া দেখছি। মাসিমা, মাসিমা। আমরা পাবদা মাছ খেতে আসিনি। ঘরে যা আছে ওই দিয়েই হয়ে যাবে।

কাঞ্চন আড়ালে চলে গেল।

কেন যে গেল, বুঝল না।

পাবদা মাছ! কী বলছ কিরণ, বাজারে পাবদা মাছ এখন ওঠেই না। গাঁয়ে কিছু কি থাকে! সব চালান হয়ে যায়। কে বলেছে, বাজারে পাবদা মাছ পাওয়া যায়।

না মা, তুমি তো পাবদা মাছ রাঁধতে ভালবাস। দেখি না গিয়ে যদি বাজারে পেয়ে যাই।

সীতেশ দেখল কিরণকে, কিরণ দেখল ছোড়দিকে। ছোঁড়ার মাথায় কী আছে! কী চায়!

এই কাঞ্চন। কাঞ্চন!

আস্তে যাই।

তোর এখানে খেতে আসিনি। আমরা কী খাব না খাব, মাসিমাকেই ঠিক করতে দে। ঘরে এসে বোস। এত আস্তে আস্তে করছিস কেন?

ঘরে না ঢুকেই ছোড়দির দিকে তাকিয়ে কাঞ্চন বলল, কতদূর থেকে এসছ! বাথরুমে ঠান্ডা জল আছে। পূজনমাসি শাড়ি বের করে দিচ্ছে। চানটান করে বেশ ঠান্ডা হয়ে বসাই ভাল। কী ছোড়দি ঠিক বলিনি!

কাঞ্চন কিছুতেই ঘরে ঢুকতে চাইছে না। ঢুকলেও থাকছে না। নানা অজুহাত দেখিয়ে বের হয়ে যাচ্ছে। বোঝাই যাচ্ছিল, ছোড়দি উত্তপ্ত হয়ে উঠছে। ছোড়দিকে দোষও দেওয়া যায় না।

দাখ বাঁদরামির একটা সীমা আছে কাঞ্চন। আমাদের তুই কী পেয়েছিস! হ্যাঁ রে তোর কাণ্ডজ্ঞানের এত অভাব। পড়বি কখন—শেষ করবি কখন। আমরা ফিরব কখন!

ওর জন্য ভেবো না ছোড়দি। ঠিক পড়ে ফেলব। খেয়েদেয়ে বসাই ভাল।

একটি মেয়ে উঁকি দিয়ে বারান্দা থেকে তাদের দেখে গেল। ছোড়দি কেন, সবাই লক্ষ করেছে।

মেয়েটা কে রে?

নলিনী। হেরম্ব সাধুর মেয়ে।

সীতেশ বলল, মনে হয় জ্বলছে।

না না। সে জ্বলার পাত্রই নয় সীতেশদা। দ্যাখ না ঘরে ঢুকে গেল বলে। মার কাজে খুব সাহায্য করে। খুব ভাল মেয়ে। তারপর কিছুক্ষণ কী করা যায় ভেবে, ওরা লাইনের দিকে বেড়াতে গেল। কাঞ্চনকে ছেড়ে দিল না। খেয়ে দেয়ে বসা যাবে—একটু ঘুরে ফিরে দেখা। জায়গাটা স্টেশনের লাগোয়া। লাল সুরকির রাস্তা—খাল ডোবা পার হলে রেল-লাইন—আরও পরে—বিশাল বিল। বিলে জল নেই। ধূ ধূ প্রান্তর। ছোড়দির চুল উড়ছিল। আঁচল উড়ছিল। ছোড়দি কিছুটা ক্ষুব্ধ—কারণ কাঞ্চনের এই নির্বিকার আচরণ তাকে ভিতরে ভিতরে ক্রোধী করে তুলছে। কেউ কিছু লিখলে—শোনানোর এত আগ্রহ থাকে, আর কাঞ্চন একটা সম্পূর্ণ উপন্যাস লিখে ফেলেছে, শোনাবার যেন বিন্দুমাত্র ইচ্ছে নেই।

তবে কি তাদের মতামতের সে দাম দেয় না।

নাকি, এতটা পড়ে শোনাতে হবে—তার তাতেও কষ্ট। কিসে যে কষ্ট নেই তার, আবার মনে হয়, কোনও কষ্টই তাকে পীড়ন করে না। সঙ্গে নিয়ে তো কম ঘোরেনি।

জানালা খুলে রাখছি। হাওয়া পাবি।

ভয় করে ছোড়দি। জানালা বন্ধ রাখাই ভাল।

পায়ের কাছে চাদর থাকল। শেষ রাতের দিকে ঠাণ্ডা পড়ে।

আমার চাদর আছে।

পৃথিবীতে বেঁচে থাকাটাই ওর কাছে বাহুল্য, বুঝলে কিরণদা। জানালা খুলে শুতে ভয় পায়, ওর চাদর লাগে না, কিছুরই দরকার নেই, একে নিয়ে তোমরা কতদূর যাবে।

কিরণ সাইকেল চালিয়ে সুধাময়বাবুর দোকানে হাজির।

আরে আসুন। সীতেশের বাড়িতে যেতে পারলাম না। শুনলাম জব্বর অনুষ্ঠান করেছেন।

কাঞ্চন এসেছিল?

কাঞ্চন, দাঁড়ান। ভিতরের দরজা খুলে বাড়ির ভিতর ঢুকে গেল। কেউ খবর যদি রাখে। সকালের দিকটায় সুধাময়বাবুর ছোটভাই লাটু দোকানে বসে। মাসিমাও অনেক সময় চেয়ার দখল করে বসে থাকেন। শহরের বিখ্যাত ঘড়ি বিক্রয় এবং মেরামতের দোকান। হলঘরের মতো সাজানো গোছানো এবং কিরণ এখানে এলে সুন্দর একটা গন্ধও পায়।

সুধাময়বাবু ফিরে এসে বললেন, বসুন না। সাইকেল কি ছাড়তে চাইছে না।

কাঞ্চন আসেনি তা হলে!

আসার কথা ছিল বুঝি?

আর কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। সে সাইকেলের প্যাডেলে চাপ দিয়ে বলল, আসছি। পরে দেখা হবে।

কোথায় যেতে পারে। শেষ আস্তানায় যাবার আগে এদিক ওদিক টু মেরে যাওয়া দরকার। তা ছাড়া এলে সীতেশ কিংবা ছোড়দি কেউ না কেউ ফোন করে বলত। এসে গেছে—ধরে প্যাঁদাবেন বলেছিলেন, আটকে রেখেছি।

একে আটক রাখা যায় না। দোষ করলে বালকের মতো হেসে ফেলে। এটা যে অমার্জনীয় অপরাধ বোঝেই না। বুঝলে বলতে পারে, উপন্যাস শেষ!

বুঝলে বলতে পারে, বাজারে যাচ্ছি। ছোড়দি পাবদা মাছ খেতে ভালবাসে। মা দারুণ ঝোল করে। মার হাতের এত সুন্দর রান্না তোমরা খাবে না হয়। মার ইচ্ছে বাজারটা ঘুরে আসি।

তখনই সে বুঝেছিল, কোথাও গণ্ডগোল আছে। তা না হলে খাওয়া দাওয়ার পর বলতে পারে, নদীর পাড়ে গিয়ে বসি! আচ্ছা উপন্যাস লিখতে গেলে যে সোসাল কমিটমেন্টের প্রশ্ন থাকে।

লেগে গেল ফটাফাটি। কাঞ্চন এত শয়তান! সে তো জানে—সীতেশ আর তার মধ্যে এই কমিটমেন্টের প্রশ্ন উঠলেই তর্ক শুরু হয়ে যাবে।

শিল্পীর আবার কমিটমেন্ট কী। তার যদি কোনও কমিটমেন্ট থাকে, তবে নিজের কাছে, মানুষের কাছে।

না কিরণদা আমি তোমার কথা মানতে পারছি না। লেখায় আদর্শ থাকবে না!

সোনার পাথর বাটি। শিল্পীর নিজস্ব জগৎ আছে। তিনি সেখান থেকে উঠে আসেন। বোধের জগৎ বলতে পার। চোর খুনি লম্পট সাধু সব তার কাছে সমান। সে-ই তত বড় শিল্পী যিনি সামান্য বিষয়কে অসামান্য করে তুলতে পারেন। আদর্শ তো কম ফলানো হয়নি। মহাপুরুষরা কত বড় বড় কথা বলে গেছেন। দু-হাজার বছর আগে, তারও আগে থেকে, যিশু, বুদ্ধ, চৈতন্য—যাঁর কথাই বলিস—তাঁর দিস্তা দিস্তা কথা বলে গেছেন। এতে পৃথিবীর কচু হয়েছে। দাঙ্গা, যুদ্ধ, ধর্ষণ সেই সমানে চলিয়াছে।

সীতেশ জানে, তার বক্তব্যের উপর গুরুত্ব আরোপ করার জন্য শেষ বাক্যটিতে কিছুটা সাধুভাষা প্রয়োগ করে থাকে। কিন্তু এটা যে বদমাসটার চাল বুঝতেও পারেনি। এ-সব ক্ষেত্রে ছোড়দি আর কাঞ্চন প্রায় নীরব শ্রোতা। কাঞ্চন বোকার মতো এমন সব কথা বলে যাতে তর্কটিকে উসকে দেওয়া যায়।

সে তা করেওছিল।

কিরণদা আসলে তুমি বলতে চাইছ—কবি লেখক শিল্পী সবাই এক একটি শামুক।

তার মানে!

বা রে শামুক তো নিজের মধ্যে লুকিয়ে থাকে। তার কি চৈতন্য নেই বলতে চাও। পোকামাকড়, গাছপালা, লতা, ফুল সবারই চৈতন্য আছে। যে যেমন বোঝে। আমি কিন্তু নিজেকে শামুক ছাড়া কিছু ভাবি না।

ব্যাখ্যা তার পছন্দ হয়েছিল।

ঠিক ঠিক। কবি লেখকরা শামুক হতে না পারলে—নিজস্ব পৃথিবী গড়ে তুলতে পারে না। চর্বিত চর্বণ হয়ে যায়।

কিরণদা!

বল।

সবই ঠিক। তবে শামুকের ক্ষমতা কতটুকু বল। তার দশগজ রাস্তা পার হতে দিন কাবার হয়ে যায়। শামুকের গতিবিধি লক্ষ করে দেখেছি—জানো, কোনও শব্দ পেলেই সে তার জিভ, শুঁড় ভিতরে খটাস করে ঢুকিয়ে ফেলে। দরজা বন্ধ করে দেয়।

তুই কি আরম্ভ করবি, না উঠে পড়ব?

রাগ করছ কেন ছোড়দি। তর্কের মীমাংসা হবে না?

তর্কের মীমাংসা হয় না। হয় না বলেই তর্ক বেঁচে থাকে। লক্ষ্মীছেলে আমার, লেখাটা বের কর। শুরু কর।

ছোড়দি ঘড়ির দিকে তাকিয়েছিল।

তিনটে বাজে।

বাজুক না। জোর আধঘন্টা সময় নেব ছোড়দি।

তার মানে!

আধঘন্টাতেই শেষ হয়ে যাবে।

কাঞ্চন আর যদি তোর বাড়িতে আসি মুখে আমার ছাই দিস। চলো কিরণদা, ওকে তোমরা এখনও চিনলে না। কিছুই লেখেনি।

ছোড়দি তোমার সঙ্গে মিছে কথা কখনও বলি! তোমার গা ছুঁয়ে বলছি, উপন্যাস শেষ। তারপরই মা মা ডাক।

মার সাড়া না পেয়ে মাসিকে ডাকাডাকি।

পূজন মাসি, এক গ্লাস জল দেবে।

তা হলে আরম্ভ সত্যি হবে। কবিতা পাঠের সময় কাঞ্চন বার বার জল খায়। সামান্য জল। জল খাবার সময় চোখ বুজে ফেলে। তখন ছোড়দির ইচ্ছে হয় চুল ধরে টানতে। একবার যেন কোথায়, চুল ধরে ঝাঁকিয়েও দিয়েছিল।

এই ঘুমিয়ে পড়লি!

না না। জল ভিতরে নামছে। কী আশ্চর্য শব্দ তার!

যাই হোক, যখন জম্পেশ করে সবাই প্রস্তুত শোনার জন্য, যখন, একগাদা খাতা থেকে টেনে বের করল, ফুলস্কেপ কাগজে ভাঁজ করা দশটি পাতা, তখন আর মাথা ঠিক রাখা যায়? দশ পাতা উল্টে পাল্টে দেখিয়ে বলে কি না—এই সেই মহার্ঘ বস্তুটি—যার নেশা গরিবের বাড়িতে তোমাদের এতদূর টেনে এনেছে।

সবাই স্তম্ভিত।

দশ পাতা!

কেন ছোড়দি, দশ পাতায় উপন্যাস হয় না!

যেন ছোড়দি পারলে ঝাঁপিয়ে পড়ে কাঞ্চনের উপর। আঁচড়ে কামড়ে শেষ করে দিতে

চায়। ওঠ। বের হ।

সীতেশ আর এক ধাপ এগিয়ে চিৎকার করে উঠেছিল, কিরণদা মারো এক লাথি। পাছায় লাথি মেরে শেষ করে দাও।

আমাকে মেরে ফেলবে কেন ? আমার কী দোষ ! দশপাতায় উপন্যাস কেন হবে না !

ক্ষোভে দুঃখে ছোড়দির চোখে জল এসে গেছিল।

কিরণদা আমি উঠছি। বাঁদরামির সীমা থাকার দরকার। আমরা তোর পরিহাসের পাত্র কাঞ্চন ! লাই দিয়ে তোমরা ওকে মাথায় তুলে দিয়েছ। তুমি, তুমি !

সীতেশের দিকে ছোড়দি আঙুল তুলে বলছে, তুমি যত নষ্টের গোড়া। কেউ আমাকে এত অপমান করেনি, জানো !

কাঞ্চন খুবই যে বিব্রত বোধ করছিল সন্দেহ নেই। বেচারা মাথা নিচু করে বসে আছে। ছোড়দির চোখে জল দেখে খুবই অপ্রস্তুত। তারও চোখ জলে ভেসে যাচ্ছিল। নয় তো জামার খুঁটে চোখ মুছবে কেন !

কিরণ পড়ে গেছে মহা ফাঁপড়ে। কাকে লাথি মারবে, কার চোখের জল মোছাবে আর কার মাথা ঠাণ্ডা করবে বুঝতে পারছিল না। কিছুটা মধ্যস্থতার ভঙ্গিতে বলল, দেখি তোর দশপাতা। কী লিখেছিস দেখি। পিন দিয়ে গাঁথা দশটি পাতার উপরে দেখল—খুব সুন্দর হস্তাক্ষরে লেখা, 'কোনও সাধুর জীবনকাহিনী' পরে নাম, কাঞ্চন নিয়োগী। যেন ঝকঝকে ছাপার অক্ষরে লেখা। পড়তে বিন্দুমাত্র অসুবিধা নেই। সে কিছুটা চোখ বুলিয়েই বলল, ঠিকই তো আছে। শুরুটা দারুণ। দশ পাতার পর আরও দশ পাতা। তারপর আবার দশ পাতা। আবার। আবার। চলবে। ছোড়দি, শুনবে !

না।

সীতেশ শুনবি !

না।

শোন, রাগ করলে হবে ! কার উপর রাগ করছিস। শামুকের খোলে গুটিয়ে আছে। তার উপর রাগ করে কার কী ক্ষতি বৃদ্ধি হবে ! আসল কথা ওকে খোল থেকে বের করে আনতে হবে। ছোড়দি তুমিই পার।

সঙ্গে সঙ্গে কাঞ্চন যেন জোর পেয়ে গেল।

হ্যাঁ ছোড়দি, তুমি আমার নীল সন্ধ্যা। তুমি আমার চালধোয়া স্নিগ্ধ হাত। ধান মাখা চুল। ডাঁশা আম, কামরাঙা,কুল। তুমি সাহস দিলে আরও দশ পাতা কেন একশ পাতাও লিখে ফেলতে পারব।

কাঞ্চনের এমন নিষ্পাপ কথায় ছোড়দি স্থির হয়ে গেল। আঁচল সামলাল। শাড়ি টেনে দিল। আর রা নেই।

তা হলে পড়ি।

পড়ো।

সীতেশ কিছু বলছে না।

কী রে তুই কোনও মতামত দিলি না যে !

ব্যাজর ব্যাজর করো না তো। পড়তে হয় পড়ো। দশ পাতা শুনে কী হবে এটাই বুঝছি না।

ফের দশপাতা। এই ফেরের পাল্লায় ফেলে দিতে না পারলে কাঞ্চনকে দিয়ে উপন্যাস শেষ করানো যাবে না। কাঞ্চন কথা দিয়েছে ফের দশ পাতা।

কাঞ্চন ছোড়দির মুখের দিকে তাকাল। ছোড়দি দু হাঁটুর মাঝখানে থুতনি রেখে তাকে দেখছে—তেমনি করুণা এক বুকে আছে লেগে, বঁইচির বনে আমি জোনাকির রূপে রোগে হয়েছি কাতর—

কাঞ্চন বলল, ফের দশ পাতা। কথা দিচ্ছি।

সেই দশ পাতার কতদূর এগোল, পাঁচ সাত দিন পার হবার পরও কিরণ জানে না। কাল অনুষ্ঠানেও এল না। শেষ ঠেকে এসে কিরণ সাইকেল থেকে নামল। ঘন্টির শব্দ পেয়ে সীতেশ নিজেই বারান্দায় বের হয়ে দেখল, কিরণদা হাজির।

এসেছে?

সীতেশ মাথা ঝাঁকাল।

কোথায়?

ঠোঁটে ইশারা করে সতর্ক করে দিল। বসার ঘর পার হয়ে আরও সতর্ক গলায় বলল, উপরে। মিঠুর ঘরে।

কী করছে?

সীতেশ বলল, আস্তে। জুতো খোলো।

জুতো খুলে কী হবে?

জুতোর শব্দে টের পাবে।

কিরণের মুখটা কালো হয়ে গেল। কাঞ্চনকে নিয়ে ছোড়দি কি কোনও ব্যভিচারে জড়িয়ে যাচ্ছে। ব্যভিচারে জড়িয়ে গেলে যে মুখ দেখাতে পারবে না। তার মা, তার বোনেরা, বাবা—সবার কথা ভাবলে সে বোঝে ব্যভিচারে কী হয়।

কিরণ বলল, আমি যাচ্ছি।

না, যাবে কেন? নিজের চোখে দেখে যাও।

ছোড়দি অসুস্থ শুনলাম।

খুবই অসুস্থ। ডাক্তার এসেছিলেন। নশিয়া। মাথা তুলতে পারছে না। কেবল বমি পাচ্ছে। সারাদিনে কিছু খাওয়াতেও পারিনি।

খুবই সন্তর্পণে কথা সেরে কিরণকে নিয়ে পা টিপে টিপে ঝুল বারান্দায় ঢুকে গেল। কিরণকে বসার জন্য ইশারা করল। আড়াল থেকে কিরণ শুনতে পেল—

কী, ভাল বোধ করছ না ছোড়দি।

আর একটা পড়।

কোথায় সে নিয়ে গেছে সঙ্গে করে সেই নদী, শ্বেত মাঠ ঘাস/ সেই দিন, সেই রাত্রি, সেই সব ম্লান চুল, ভিজে শাদা হাত/ সেই সব নোনাগাছ, করমচা শামুক, গুগলি তালশাস/ ছোড়দি ভাল লাগছে?

লাগছে। পড়।

অসংখ্য কাকের শব্দে ভরিছে আকাশ/ ভোররাতে—নবান্নের ভোরে আজ বুকে যেন কিসের আঘাত/ ছোড়দি উঠতে পারবে? মুখ ধোও। কিছু খাও। খেলে ভাল লাগবে।

কিরণের কেন যে চোখে জল এসে গেল!

সীতেশের কাঁধে হাত রেখে বলল, ভয় নেই। ছোড়দি এবারে আরোগ্য লাভ করবে। ভাল হয়ে উঠবে। কবিতা জীবনে কত কিছু যে দেয় মানুষ বোঝে না। তবে কবিতার সাম্রাজ্য থেকে তুলে এনে গল্প উপন্যাসের জঙ্গলে কাঞ্চনকে ছুঁড়ে দিলে কতটা কার কী লাভ হবে ঠিক বুঝতে পারছে না।

॥ ৬ ॥

বাইরের দিকের দরজা বন্ধ। দিদি ডিউটি সেরে ফেরেনি। ফেরার সময় হয়ে গেছে। স্টোভে গরম জল করে রেখেছে পৃজন। লেবার রুম থেকে ফিরেই গা ধোয়া চিরদিনের অভ্যাস। শ্বাসকষ্টে এত ভোগে—তাও শীত গ্রীষ্মে সমান। ঘরে ঢুকে গঙ্গাজল শরীরে ছিটিয়ে দেয়। হাতের কাছে সব এগিয়ে দিতে হয়। না দিলেই মেজাজ গরম। তার উপর সকাল বেলায় ছেলেটা শহরে চলে গেছে—কারও কথা গ্রাহ্য করে না। কোথায় খেল কে জানে! বিকেলেও ফিরে আসেনি। মনটা লীলাদির ভার হয়ে আছে। দু-বার লোক পাঠিয়ে খোঁজ নিয়েছে, কাঞ্চন ফিরেছে?

না।

ফিরেছে?

না।

উদ্বেগ। এত উদ্বেগ পৃজনের পছন্দ না। শহরে পরিচিতজনের অভাব নেই। প্রায়ই এটা হয়। প্রায়ই সে শহরে থেকেও যায়। কোথায় থাকে, কী খায় তাও মোটামুটি জানা। কিন্তু মুশকিল, খবর না থাকলেই দিদির টেনশান। শহরে যেতে কোনও দুর্ঘটনা যদি ঘটে যায়। কিংবা ফেরার সময়ও হতে পারে। তবে যে তার শহরের বন্ধু- বান্ধবরা জানবেই না, শহরে সে পৌঁছাতেই পারেনি—তার আগেই শেষ। বাড়ি সে পৌঁছাতেই পারেনি,তার আগেই শেষ। যত দুশ্চিন্তা এই মধ্যবর্তী ফাঁকটুকু নিয়ে। এসে হয়তো গা ধুয়ে ঘরে ঢুকে বসে থাকবে। এক কাপ হরলিকস আর দুখানা বিস্কুট—টেবিলে পড়েই থাকবে। মুখে তুলবে না। ঘর বার শুরু হয়ে যাবে।

সেও জানে, লীলাদিও জানে। তারা সঙ্গে শহরে গেলে বোঝে ছেলের কদর আছে। কত অজানা মুখ উঁকি দেয় তখন। দু-কদম হাঁটলেই—এই যে কাঞ্চন তোমাকেই দরকার।

এই যে কাঞ্চন, চিঠি। সংলাপের সম্পাদক তোমাকে দিতে বলেছেন।

এই যে কাঞ্চনদা, আরে ব্বাস, গুরু এসে গেছ। চল। বাড়ি চল। তোমার কাছেই যাব ভাবছিলাম। যাক দেখা হয়ে গেল।

আরও বাড়াবাড়ি না করে ফেলে! কাঞ্চন, তাদের দেখায়— আমার মা। আমার পৃজন মাসি। শহরে কিছু কেনাকাটা আছে। ব্যস সঙ্গে সঙ্গে ঢিপ ঢিপ প্রণাম। মাসিমা আমি কাঞ্চনদার একজন গুণগ্রাহী। কী সৌভাগ্য আপনাদের দেখা পেলাম।

এতে পৃজন গর্ব বোধ করে। লীলাদি অবশ্য রেগে গেলে বলবে, সবাই মিলে কাঞ্চনের মাথাটি খেল। ওর আর কিচ্ছু হবে না। আফসোস লীলাদির—পড়ায় মনোযোগ না থাকলে এই হয়। বার বার ফেল করে যেন আমার সঙ্গে মজা করছে। ওর বাবার কত স্বপ্ন ছিল ওকে নিয়ে।

সেই লীলাদি এসে যখন দেখবে কাঞ্চন ফেরেনি, মুখ তখন আরও ব্যাজার হয়ে যাবে। সে তবু সাধ্যসাধনা করে ছেলেকে খাওয়াতে পারে—বাইরে কে আর তার জন্য এতটা ভাববে। তার তো এক কথা, না অত দেবেন না। খেতে পারব না। এই তো খেয়ে এলাম।

সে যে কিছুই খায়নি,ঘুণাক্ষরেও বলবে না। এককাপ চা আর একটা পাউরুটি খেলে তার ভোজন হয়ে যায়। কেউ কি বুঝবে! তবে কিরণ সীতেশ কিছুটা বোঝে। ওরা

কাছে থাকলে সে নিরাপদে থাকবে, লীলাদির এমনও বিশ্বাস আছে।

আর তখনই গেট খোলার শব্দ। বুঝি লীলাদি এল। গেট খুলে দু পাশের এক চিলতে বাগানের পথ ধরে বারান্দায় উঠে আসতে হয়। সে এদিকের ঘরে থাকলে গেট খোলার সঙ্গেই টের পায় কেউ এল। সামনে এক চিলতে বাগানসহ নার্সদের আলাদা কোয়ার্টার। ডাক্তারবাবুদের কোয়ার্টার তুলনায় বড়। খোলামেলা বেশি। ঘরে আলো বেশি। ডাবল জানালা। তাদের তা নেই। তবু গেট থাকায় অনেকটা নিরাপদ।

কে এল!

জানালায় চুপি দিয়ে দেখল, গেট খুলে ছেলেটি ভিতরে ঢুকতে ইতস্তত করছে।

কী খবর কে জানে!

বুকটা ধড়াস করে উঠল।

কাকে খুঁজছ।

এটা কাঞ্চনদার বাড়ি!

হ্যাঁ। কেন।

একটা চিঠি দিয়েছে সীতেশদা। কাঞ্চনদা আজ আসতে পারবে না।

সে সীতেশের চিঠিটি প্রথমে এগিয়ে দিল। পরে পকেট থেকে আর একটা চিঠি বের করে বলল, ওর মাকে দেবেন।

দুটো চিঠিই কাঞ্চনের মার নামে লেখা।

একটা সীতেশ লিখেছে। অন্যটা কাঞ্চন নিজে।

চিঠি না বলে চিরকুট বলাই ভাল।

মাসিমা, কাঞ্চনকে ধরে রাখলাম। আমার বাড়িতে থাকছে। চিন্তা করবেন না। কাঞ্চনের ছোড়দি খুবই অসুস্থ। তবে ভয়ের কিছু নেই। সে থাকলে মনে হয় ওর ছোড়দি ভাল থাকবে। খাওয়ায় অরুচি। কাঞ্চনের কথা মনে হয় ফেলতে পারবে না। কিরণদাও বলল, ওকে থেকে যাওয়ার জন্য। আপনার কুশল আশা করি।

কাঞ্চন লিখেছে—মা তুমি কিন্তু মনে করে শোবার আগে এস্থালিন খাবে। আমি খুবই দুশ্চিন্তায় থাকব। সীতেশদা কিরণদা ছাড়ল না। কাঠের ছোট বাকসোটায় এস্থালিন এনে রেখেছি। খেতে যেন ভুলে যেয়ো না। পুনঃ পূজন মাসিকে বলবে মনে করে ঠিক মতো ওষুধগুলো যেন তোমাকে খাওয়ায়।

দিদি আসার সঙ্গে সঙ্গে চিরকুট ধরিয়ে দেওয়া ঠিক হবে না। এসে জিজ্ঞেস করলে বলবে, কাঞ্চন সীতেশের বাড়িতে থাকবে। আজ ফিরছে না। এই খবরটুকুই একজন মায়ের কাছে অনেকখানি। তারপর গা ধুয়ে হরলিকস বিস্কুট খেলে চিরকুট দুটো পড়তে দেবে।

তবে শেষ পর্যন্ত কতটা পারবে সে জানে না। হাজার প্রশ্ন তখন।

কে খবর দিল। ও তো কিছু বলে যায়নি। কার কাছে খবর পেলি! কাঞ্চন নিজে জানিয়েছে, না কিরণ। সে ওর মার কথা ভাববে না! আমি তার কেউ না। দুম করে যখন তখন বাসায় না ফেরা। তারপর হতাশ হয়ে বলবে, যা খুশি করুক। পরীক্ষা সামনে। তোর মাথায় তাও নেই। বলল আর থেকে গেলি!

সীতেশের চিঠিটা না দিলেই ভাল হয়। কাঞ্চনের ছোড়দি অসুস্থ। সে থাকলে ভাল হয়ে যাবে।

আমি কি সুস্থ!

লীলাদির এমন অভিমান হতেই পারে। এতে বিড়ম্বনা আরও বাড়বে। টস টস করে জল পড়বে চোখ থেকে। টেবিলে বসে থাকবে, হরলিকস ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। পীড়াপীড়ি করলে বলবে, আমার কিছু খেতে ইচ্ছে করছে না। রাতে তোর মতো কিছু করে নে। দরকারে না হয় আমাকে এক কাপ হরলিকস করে দিস।

আসলে ক্ষোভ অভিমান হলে দিদির ভিতরও অরুচি দেখা দেয়। অথচ মুশকিল, এই অরুচির কথা, দিদি যে রাতে প্রায় কিছু না খেয়েই ছিল কাঞ্চনকে বলা যাবে না। এতে কাঞ্চনের আরও অরুচি বেড়ে যাবে। এই আতঙ্ক থেকেই দিদি হয়তো শেষ পর্যন্ত খাবে—এমনকি শোওয়ার আগে নিজেই মনে করে ট্যাবলেটটিও জল দিয়ে গিলবে।

মা আর রাতে কিছুই মুখে দেয়নি। ওষুধও সরিয়ে রেখেছে, কাঞ্চন জানতে পারলে মুখ ব্যাজার করে ফেলবে। সত্যি অন্যায় হয়ে গেছে। তার উচিত হয়নি থাকা। সে বাড়ি না থাকলে মা কষ্ট পেতেই পারে। মাকে দোষ দেওয়া যায় না। তার জন্য কেউ কষ্ট পেলে, সে নিজেও খুব কষ্ট পায়। আর তখনই যত রাগ নিজের উপর। পূজন কাঞ্চনের চরিত্র বোঝে। দিদিও বোঝে। বাড়িতে কোনও অশান্তির আঁচই তাকে স্পর্শ করতে দেওয়া হয় না। বাড়ি ফিরে সবার হাসিখুশি মুখ না দেখলে সে গুম মেরে যায়। এই আতঙ্কেই দিদি খাব না বললেও শেষ পর্যন্ত খায়। এমনকি উদ্বেগে প্রবল শ্বাসকষ্ট দেখা দিলেও বলে না, রাতে ঘুমাতে পারেনি।

ওকে আবার বলতে যাস না।

কাশতে কাশতে দম বন্ধ হয়ে এলেও, কথাটা দিদির বারবার মনে করিয়ে দেওয়ার স্বভাব। কিন্তু নলিনী জানতে পারলে ঠিক কানে তুলে দেয়। নলিনীটা যে কী! কাঞ্চন কষ্ট পেলে এত সে সুখ পায় কেন বোঝে না।

লীলাদি এসে গেছে। ঘরের এদিক ওদিক চোখ। আসলে কাঞ্চনকে খুঁজছে।

কাঞ্চন আসেনি?

সীতেশের বাড়িতে থাকবে। ওরা ছাড়ল না।

থাকুক। যা খুশি করুক।

আর কোনও কথা না বলে যেমন রোজকার অভ্যাস বাথরুমে ঢুকে যাওয়া, গা ধোওয়া, হরলিকস বিস্কুট খাওয়া—সবই চুপচাপ সেরে ফেলল। কাঞ্চন না আসায় বিন্দুমাত্র অশান্তি করল না। বরং সুযোগ পাওয়া গেছে যেন।

শোন, হেরম্ব সাধু বাসায় আছে কি না দেখে আয় তো।

পূজন বারান্দা পার হয়ে গেট খুলে বের হতেই হেরম্ব হন্তদন্ত হয়ে তার বাসার দিকেই উঠে আসছে। দিন দিন হেরম্ব পাল্টাচ্ছে। গলায় রুদ্রাক্ষর মালা, পরনে রক্তাম্বর—পায়ে খড়ম। দাড়ি রাখছে। চুল মাথার ওপর ঝুঁটি করে বাঁধা। হেরম্বকে দেখে পূজন গেট খোলা রেখেই ঘরে ছুটে ঢুকে গেল।

পূজন কেন এ-ভাবে ভিতরে ছুটে পালাল লীলা বুঝতে পারল না। কাঞ্চন বাসায় ফিরবে না, এই সুযোগে স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানার আগ্রহ থেকেই হেরম্ব সাধুর খোঁজে পূজনকে পাঠিয়েছিল। কিন্তু হেরম্ব সাধু কি তার কামনা বাসনার কথা টের পায়। জল না চাইতেই মেঘ। সে কি তার গুপ্তবিদ্যায় জেনে ফেলেছে, লীলাদি তাঁকে খুঁজছে। সকালে সে অবশ্য সাধুর খোঁজে যে যায়নি তা নয়—তবে বলে এসেছিল, সুযোগ মতো সে-ই যাবে। তাকে যেন না পাঠায় মালিনী।

এই পূজন! পূজন!

পূজন গা ঢেকে দরজার পাশ থেকে উঁকি দিল।

টিনের চেয়ার দুটো বের করে দে।

আজ্ঞে লীলাদির তলব পেয়ে আর স্থির থাকতে পারলাম না। আদ্যাশক্তিই বলল, হেরম্ব, লীলা বড় বিপাকে পড়েছে। যা। বসে থাকিস না।

না না, বিপাকে পড়িনি। বোসো। মনটা খুঁত খুত করছে। তুমি তো অনেক কিছু জান। তাই। চা খাবে ?

হউক।

বেশ হৃষ্টচিত্তে হেরম্ব সাধু পা নাচাচ্ছে। ওই পরিবারের কর্তা তাকে একবার লাঠিপেটা করেছিল। দোষ, গাঁজা ভাঙ খেয়ে মাতলামি। শিক্ষক মানুষ। প্রাথমিক ইস্কুলের শিক্ষক। অভিভাবকদের উপর প্রভাব আছে। গাঁয়ের ছেলে ছোকরারা উচ্ছন্নে না যায়—তার জন্য যষ্টির কৃপা কপালে জুটেছিল। তারই পরিবার আজ তাকে সাদরে সাগ্রহে বসতে বলছে, এটাই তার হৃষ্টচিত্তের প্রধান কারণ।

জান সাধু, কাল না বিশ্রী স্বপ্ন দেখলাম। উটের মুখ, কাকাতুয়া, রেল-লাইন—কিন্তু পরের দৃশ্যটি উচ্চারণ করতে গিয়েও থেমে গেল। দৃশ্যটা মনে হলেই ভিতরে আতঙ্ক সৃষ্টি হচ্ছে।

উষ্ট্রের মুখ দেখেছেন। আরোহণ করছেন এমন কিছু দেখেননি তো।

না। আরোহণ করলে কী হয় !

মুখ দেখলে তেষ্টা শেষ হয়ে আসছে বুঝতে হবে। কিন্তু উষ্ট্রে আরোহণের স্বপ্ন মৃত্যুর কারণ।

লীলা বলল, না না। মুখই দেখেছি। আরোহণ করিনি। তেষ্টা শেষ হয়ে আসছে—কিসের তেষ্টা।

আজ্ঞে দিদি ডিম্বাধিপতির চিমটার কামড় শেষ হয়ে আসছে। আজ্ঞে হেরম্ব সাধু সব দেখতে পায়। তার মানসলোক পরিষ্কার থাকলে সব স্বচ্ছ হয়ে যায়। বলেই চোখ বুজে ঘাড় কাত করে দিল। যেন এ মুহূর্তে সে বিশ্বসংসারের বাইরে—অনাদি অনন্তে ডুব দিয়েছে।

সাধুর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ছে, গাড়ি করে নড়াজলের জমিদারদের শরিক হেমন্ত রায় কলকাতায় পর্যন্ত নিয়ে গেছে। তবে সাধুর এই একটা গুণ—সে দান গ্রহণ করে না। দান গ্রহণ করলে আদ্যাশক্তির ক্ষোভ বাড়ে। সাধুকে নিয়ে মচ্ছব কর, কীর্তন কর ক্ষতি নেই। সে গৃহী মানুষ। তার খুব বেশি প্রয়োজনও নেই। এই অসামান্য আদ্যাশক্তির আরাধনায় শিবনেত্র হয়ে থাকার জন্য বটগাছটা তার দরকার। মন্দির দরকার। করালবদনা, বিশ্ব বিনাশের এবং সৃষ্টির দেবীর দরকার। মানুষের হিতার্থে সে শনি মঙ্গলবারে মহাশ্মশানে রাত কাটায়।

হেরম্ব সাধুকে পাওয়াই কঠিন। সেই সাধু তাকে আজ্ঞে আপনি করে।

ডিম্বাধিপতিটা কী সে জানে না।

ডিম্বাধিপতি কে ?

যিনি ডিম্বের অধীশ্বর। যিনি ডিম্বকোষের অধীশ্বর। আদ্যাশক্তি আর ডিম্বাধিপতির যুগল মিলনে বিশ্বসংসার। জন্মলগ্নেই কামড়টার শুরু। শেষ হয় চিতায় উঠলে। চিমটা বোঝেন—চিমটার গুণাবলি ব্যাখ্যা করা সহজ নয়। চিমটা দিয়ে তুলছে, ঝুলিয়ে রাখছে। চিমটার কামড় আলগা হয়ে যাচ্ছে। আপনার তাই হয়েছে দিদি। আপনি মুখ

দেখেছেন—আর কিছু দেখেননি তো। গূঢ় কথাটি খুলে বলুন। চুপ করে আছেন কেন : স্বপ্নের শেষ থাকবে না। কাকাতুয়া উড়ে গেল কোথায়। কাকাতুয়াকে তাড়া করল কে ?

ভিতরে লীলা কাঁপছে। হেরম্ব কি তবে সব জানে! তার স্বপ্নের রেলগাড়ি থেকে কাঞ্চনের রেলের লাইনে পড়ে থাকা—সবই কি তার নখদর্পণে।

লীলা কোনও রকমে বলসঞ্চারের চেষ্টা করছে।

তুমি হেরম্ব, সবই জান! আমার কাঞ্চনের কোনও ক্ষতি হবে না তো।

পূজন টিপয়ে চা রেখে গেলে তার দিকে পলকে তাকাল। পূজন তাকাতে পারল না। তাকালেই মনে হয় কী যেন এক আকর্ষণ—চোখে।

পূজন পালাতে পারলে বাঁচে।

হেরম্ব চোখ তুলে মিষ্টি হাসল। তারপর দু'বার কাশল—পূজনদিদি, উরুতে তার জন্মদাগ ছিল।

পূজনের বুক কাঁপছে। সে পা বাড়াতে পারছে না। তার স্বামীর উরুতে সত্যি দাগ ছিল।

উরুতে জন্মদাগ থাকলে নষ্টচরিত্র ও পরদারলোভী হয়। তিনিই চিমটায় তোলার সময় যার যা দাগ দেবার দিয়ে দেন। মনে কষ্ট রেখো না। তোমার বগলের কাছেও আছে। কী নেই!

লোকটা জানে কী করে! তার তো বগলের কাছে সত্যি আছে।

সে এসে এবারে থামে হেলান দিয়ে দাঁড়াল।

কী হয় থাকলে!

এখন বলা যাবে না। লীলাদি আছেন। গুরুজন। পরে সময়মতো জেনে নিয়ো।

পূজনের গা রি রি করছে। কেন যে বলতে গেল, কী হয় থাকলে! এখন সে কী করবে। দিদি কী না ভাবল। যেন আর কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলে রাতে সে শুয়ে শুয়ে কী ভাবে তাও বলে দেবে। লোকটার এই গুপ্তবিদ্যার আকর্ষণে সেও শেষ পর্যন্ত আকৃষ্ট হচ্ছে! সে আপাতরক্ষা পাবার জন্যই ভিতরে ঢুকে দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে থাকল। দিদি তাকে সাধুর খোঁজে পাঠাল, কী এমন জলে পড়ে গেছে দিদি সে বুঝছে না। দিদি কি টের পেয়ে গেছে পূজন রাতে ঘুমায় না। শরীরের কামড়ে কষ্ট পায়।

কী করা হেরম্ব। তুমি তো অনেক জান, ওষুধ কিছু আছে ? কাঞ্চন বাড়ি নেই সুযোগ বুঝেই তাকে ডাকতে পাঠিয়েছিল।

যেন আগের কথায় মন দিল হেরম্ব সাধু।

দেখুন দিদি খুলেই বলি। স্বপ্নের নানা সময় সুযোগ থাকে। কৃষ্ণপক্ষে দেখলে একরকমের। শুক্লপক্ষে দেখলে আর একরকমের। ভোররাতের স্বপ্ন, মধ্যরাতের একই স্বপ্নে দুস্তর ফারাক থাকে। তা ছাড়া স্বপ্নের প্রহর নিরূপণও দরকার। কাত হয়ে শুয়েছিলেন না চিত হয়ে শুয়েছিলেন বোঝার দরকার। পক্ষ, সময়, প্রহর, শয়নকালীন অবস্থা স্বপ্নের ফলাফলে বিচার্য বিষয় হয়ে থাকে। যেমন ধরুন স্বপ্নে উষ্ট্র দর্শনে অর্থলাভ হয়ে থাকে। আরোহণে মৃত্যু ঘটে। কবুতরের স্বপ্নে লক্ষ্মীলাভ হয়। খরগোশ দেখলে লোকের অপ্রিয়ভাজন হতে হয়। আকাশ মার্গে নিজেকে ভ্রাম্যমাণ স্বপ্নদৃষ্টে প্রবাসবাসী হতে হয়।

আমি কি আর বেশিদিন বাঁচব না হেরম্ব।

আজ্ঞে লীলাদি তা বলতে পারব না। মৃত্যুযোগ কী কারণে ঘটে বলতে পারি। তবে

মৃত্যুর কথা কেউ বলতে পারে না। কে কবে যাবে, কেউ জানে না। মিছে কথা বলি না। বললে আদ্যাশক্তি কুপিত হবেন।

হেরম্ব সাধুর এই অকপট স্বীকারোক্তিতে লীলা আরও যেন গলে গেল। যা জানে না বলে না। যা জানে বলে। সে চোখ বুজলে অনেক কিছু দেখতে পায়। এর নাম কি মানসভ্রমণ। মানুষের দূরবর্তী খবরাখবর কি সে সত্যি পায়।

হেরম্ব চোখ বুজে আবার কী ভাবছে।

তারপর উচ্চারণ করল—পিতৃারিষ্ট। আজ্ঞে লীলাদি আপনার পুত্রের পিতৃরিষ্ট যোগ ছিল। দাদা অকালে গেলেন। সাধারণত বালকের জন্মলগ্নের দশম স্থানে শনি, ষষ্ঠ স্থানে চন্দ্র, সপ্তম স্থানে মঙ্গল এবং সূর্য যদি শুভ দৃষ্ট না হন, তিনটি পাপগ্রহের বশীভূত হয়ে পড়েন, তবে বালকের পিতার মৃত্যু অনিবার্য।

হেরম্ব আমি তোমাকে লুকিয়ে গেছি।

আজ্ঞে লীলাদি কিছুই লুকাননি। স্বপ্নের কিছুটা বলেছেন, বাকিটা বলেননি। এই তো ?

হ্যাঁ, হেরম্ব। আমি দেখলাম খোকা রেললাইন ধরে ছুটছে। তারপর দেখলাম লাইনের ধারে খোকা পড়ে আছে। এখন আমি কী করব!

সে কি কোনও যুবতীর কাছে যায়।

না, যায় না।

পূজন মুখ বাড়িয়ে না বলে পারল না, ওর ছোড়দি...

সে যাই হোক। ওটাই রেললাইন। ইস্টিশনে গাড়ি হয়তো ঠিকই পৌঁছে দেবে। কিছু অমঙ্গল দৃষ্ট হচ্ছে।

হেরম্ব আবার চোখ বুজল।

লীলা অপলকে হেরম্বকে দেখছে। লোকটাকে সে কম কুৎসিত ভাবেনি। কিন্তু এই মুহূর্তে যেন পবিত্র কোনও কাজে হেরম্ব নিজেকে উৎসর্গ করে দিয়েছে। মালিনী ঠিকই বলেছে, সে মারলেও সুখ দিদি। কত বড় মানুষ তোমরা তো জান না!

হেরম্ব এবার চোখ খুলে বলল, ভয়ের বিশেষ কিছু নেই। ওর খিদে নেই। আহারে অরুচি। রোগাপটকা, অসুখের ধাত—সর্দি, কাশি, জ্বর-জ্বর ভাব ছেড়ে যাবে আস্তে আস্তে। কাকাতুয়ার পিছনে ছুটছে—ছোটাটাই হল কথা। ছুটতে ছুটতে আহারে তার রুচি ফিরে আসবে। রক্তসঞ্চালন হবে, সুনিদ্রা হবে। আহারে রুচি ফিরবে।

আসলে হেরম্ব সাধু আশাই করেনি লীলাদি কখনও তাকে ডেকে পাঠাতে পারে। তার এই গুপ্তবিদ্যার বড়াইকে সহ্য করে না। লোক ঠকানো ব্যবসা। মানুষের নানাপ্রকার মগজ ধোলাই পদ্ধতির এটি একটি। মানুষ দুর্বল প্রকৃতির। ঠিক জায়গায় ছুঁয়ে দিলেই হল। লীলাদির দুর্বল মুহূর্তে সে এ-বাড়ি ঢুকে যেতে পেরেছে। খোকা বোধহয় বাড়ি নেই। বাড়ি থাকলে লীলাদি এত অনায়াসে বসতে বলতে পারত না। চা খেতে বলতে পারত না। পুত্রটি যতই দুর্বল হোক, মানুষের ধূর্তামি ঠিক টের পায়।

খোকাকে দেখছি না।

শহরে গেছে।

আজ ফিরবে না বুঝি।

না ফিরবে না।

হেরম্ব সাধু মাথা ঝাঁকাল দু'বার। চাটুকু শেষ করল। বারান্দায় আলো জ্বালা। বাইরে

জ্যোৎস্না। ইস্টিশনে একটা মালগাড়ি থেমে আছে। নলিনী খবর দিয়ে গেছে, কারা দেশায় অপেক্ষা করছে দেখা পাওয়ার জন্য। তার এই শুভবিলা তবে যথার্থই ছড়িয়ে পড়ছে। মন্দিরও হয়ে যাবে। মন্দিরের দরজা খুলে দেওয়া, ফুল তোলা, ভোগ আরতির বন্দোবস্ত থেকে ধূপধুনোর জন্য পূজারির মতো পলকা একটা শরীর দরকার। রহস্যটি ঝুলিয়ে দিয়ে গেল। এখন কবে কখন ফাঁক খুঁজে যায়, দেখা দরকার।

যদি আজ্ঞা করেন তবে উঠি দিদি।

লীলা বলল, শ্মশানে রাত কাটাও, ভয় করে না।

শ্মশানের মতো পবিত্র জায়গা আর আছে দিদি। ওখানে বসলে মনঃসংযোগে সুবিধা হয়। নদীর ভাঙনের দিকটায় চড়া পড়তে শুরু করেছে। ছই করে দিয়েছে চটিরাজমশাই। রাতটা বড় মনোরম লাগে। হজ্জিবাড়ি মনে হয়। আগুন, ধোঁয়া, মরা পোড়া গন্ধ—হরিধ্বনি—গুঞ্জন শেষবেলা এই। কোথায় থাকে গোপন অভিসার, কোথায় থাকে স্ত্রী পুত্র পরিবার—উপগত হবার হরেক রকম ভঙ্গি—সব ভাবি, আর হাসি। জীবনের এই হল মজা।

হেরম্ব সাধুর কথাবার্তায় কিছুটা যে জাদু আছে লীলা টের পেল। পূজন টের পেল মালিনী এক তান্ত্রিককে নিয়ে ঘর করছে। কবে বাসায় মরার খুলি না তুলে এনে বলে, এই তো দেখলে—তবে আর অবাধ্য হচ্ছ কেন। জীবন যখন আছে তাকে চেটেপুটে খাওয়াই ভাল।

চেটেপুটে খাওয়া দূরে থাকুক, খাওয়ার স্পৃহাই কাঞ্চনের জন্মায়নি।

ছোড়দি গলা পর্যন্ত চাদরে ঢেকে রেখেছে। মাঝে মাঝে কাঞ্চনের মুখের দিকে অপলক তাকিয়ে থাকছে। এত সুন্দর চোখ মুখ, আর এত লম্বা, আর একটু মাংস লাগলে সুপুরুষই বলা যেত। হাতে বই। শীর্ণ লম্বা আঙুল। নখ বড়। দাড়ি কামায় না। দাড়ি তার বড়ও হয় না। যতটুকু দরকার, হালকা দাড়ি—মুখ আরও ভরাট করে রেখেছে।

ইজিচেয়ারে শুয়ে আছে কাঞ্চন। টিপয়ে জলের গ্লাস। কবিতা কত সুদূরের কথা বলে, ওর কণ্ঠে কবিতা আবৃত্তি না শুনলে সে যেন জানতেই পারত না।

সে কাত হয়ে শুয়ে আছে বিছানায়।

কাঞ্চন কবিতা পড়ায় মগ্ন। আশ্চর্য এতে তার কোনও ক্লান্তি নেই।

ছোড়দি এই কবিতাটা শোনো।

সব কবিতাই ছোড়দির পড়া। অথচ যতবার পড়া হয় মনে হয় নতুন কবিতা। সে চোখ বুজে শুনতে ভালবাসে। এত ভালবেসে কেউ তাকে আজ পর্যন্ত কোনও কবিতা শুনিয়েছে বলেও জানে না।

দল বেঁধে কোথাও গেলে কোরাসে কবিতা পাঠ—জানালায় মুখ—ট্রেন স্টেশন ছেড়ে মাঠ পার হয়ে চলে যায়। চাষিবউ সন্ধ্যায় ফেরে নিজ গৃহকোণে, দূর থেকে ভেসে আসে কোনও রাখালের—হাঁসের পালক, পুকুরের জল, চাঁদা সরপুঁটিদের ঘ্রাণ, সব ঘ্রাণ শস্যের সঙ্গে মিশে গিয়ে পৃথিবী বড় রহস্যময় হয়ে ওঠে। তাদের কোরাসে উল্লসিত হয় সারা কামরা। কাঞ্চন কোরাসে গলা মেলায় না। সে সবার সঙ্গে থেকেও যেন বড় একা।

সব সময় সীতেশ না হয় কিরণদার দুশ্চিন্তা। কোথায় থাকে। কবিতা পাঠের আসরে সে সবার শেষে—বড় সঙ্কোচ তার জীবনে। কবিতা পাঠে।

ছোড়দি বলল, তোর কি উপন্যাসটা লিখতে ইচ্ছে হচ্ছে না।

ইচ্ছে হচ্ছে না, ভালও লাগছে না। তবু বলতে পারে না—সে বলল, কেন লিখছি

তো। দ্যাখ হয়ে যাবে।

তোর কবিতার হাতটা না নষ্ট হয়ে যায়। ভয় করে।

কেমন বিষণ্ণ দেখাল ছোড়দির মুখ। ছোড়দি বিষণ্ণ হয়ে গেলে তাকে আরও সুন্দর দেখায়। লম্বা ঋজু শরীর। অরুন্ধতীর মতো হুবহু দেখতে। তার প্রায় স্বপ্নের নায়িকা। সীতেশ বাড়ি নিয়ে গেলে সে প্রথম ছোড়দিকে দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেছিল। প্রিয় নায়িকা কখনও কতবার তার কবিতায় উঠে এসেছে। ছোড়দি জানতই না—'আকাশ এক চঞ্চু হরিণের মতো—বিশাল অন্ধকারে অসীম অনন্ত সে/ সে আছে বলেই ধ্রুবতারা ওঠে/ সপ্তর্ষিমণ্ডল থাকে অখণ্ড। যত দূরেই যাও, হিজলের বনে কিংবা বাঁশের জঙ্গলে/যদি মনে করো ঘাসে যাবে মিশে/ তবু সে আছে, আকাশে এবং অনন্তে।'

কাঞ্চন সেই নারীকে এত কাছে পাবে কখনও বিশ্বাসই করত না।

তোমরা যমজ বোন?

কী যে তোর মাথায় পোকা ঢুকে গেছে। যমজ বোন হতে যাব কেন। কার সঙ্গে কার তুলনা। আমি তাকে পর্দায় দেখেছি। তুইও। তার চেয়ে বেশি তুই তাকে জানিস না। আমিও না। আর শোন, আমি আমিই। কারও ডামি ভেবে যদি পুলক বোধ করিস, মারব এক থাপ্পড়। এতে আমাকে অপমান করা হয় না!

কাঞ্চন ছোড়দিকে একা পেয়ে একদিন মনের সংশয় দূর করতে গিয়ে কড়া ধমক খেয়েছে। তারপর সে আর কখনও ভাবেনি, ছোড়দি তার অন্য কেউ। ছোড়দি সীতেশদার ধর্মপত্নী। সবাই ছোড়দি ডাকে কেন তাও সে জানত না। তবে প্রেসের কর্মীরা বলত, ছোড়দি এইমাত্র বের হয়ে গেল। প্রেসের কর্মীদের মতো সীতেশদার স্ত্রী এখন প্রায় সবার ছোড়দি। কখনও চঞ্চল, কখনও গম্ভীর—আবার অহেতুক তরলমতি হতেও দেখেছে। তরলমতি হলেই ছোড়দিকে সে বেশি কাছের মনে করে।

আজ বিকেল থেকে ছোড়দিকে একবারও হাসতে দেখেনি। কী যে খারাপ লাগছে! সে না আসায় ক্ষোভ থাকতে পারে। কিন্তু একবারও বলেনি, তুই কী রে। এলি না। গল্প না থাকলে কবিতা পড়তে পারতিস। তোর কবিতা কে না শুনতে চায়। সবারই কত আশা। আর কথা নেই বার্তা নেই ডুব মেরে দিলি!

এমনকি চেঁচিয়ে বলেওনি, ওকে বাড়ি ঢুকতে দেবে না সীতেশ। দরজা বন্ধ করে দাও।

তার উপর কোনও কারণে খেপে গেলে, ধুন্ধুমার কাণ্ড বাধিয়ে বসে। বের হ। কেন ঢুকলি! কাকে বলে ঢুকলি!

ছোড়দি অসুস্থ শুনে ছুটে এসেছিল। কী হল ছোড়দির। সারারাত কেন বমি করে ভাসাল।

সীতেশই বলেছে, খুব অন্যায় করেছিস।

খুব অন্যায় কেন হবে। সে না আসতেই পারে। সে ছাড়া সবাই তো ছিল। একজন না এলে কোনও অনুষ্ঠান অর্থহীন হয়ে যাবে কেন।

ছোড়দি!

হুঁ।

এবারে চলো খাবে। সারাদিন কিছু খাওনি। সীতেশদা দু-বার ঘুরে গেছে। নীচে নামতে পারবে। না উপরে দিতে বলব।

বোস। দেখি। বলে আঁচল সামলে উঠে বসতে গেল। যেন পারছে না। হাত দুটো

বাড়িয়ে দিয়েছে।

সে-ও তার হাত বাড়িয়ে দিতে সহসা ছোড়দি তার করপুটে কাঞ্চনের হাত জড়িয়ে ধরল। তারপর কাটা গাছের মতো ঢলে পড়ল বিছানায়।

ইস কী ঠাণ্ডা তোর হাত দুটো কাঞ্চন।

খুব ঠাণ্ডা।

একেবারে বরফ।

খুব ক্ষীণ গলায় কথা বলছে। দুর্বল। সারাদিন মুখে কিছু দিতে পারেনি। জল খেয়েও বমি করে দিচ্ছিল। এমন প্রাণোচ্ছল নারীর এত বড় সর্বনাশ সে কেন যে করতে গেল! সে না আসাতেই ছোড়দি পাগলের মতো গিলেছে। কেউ বাধা দিতে গেলে গ্লাস ছুঁড়ে মেরেছে। কেউ কাছে যেতে পর্যন্ত সাহস পায়নি। কিরণদা চুপি চুপি সব সরিয়ে না দিলে কী হত বলা মুশকিল।

সীতেশদাই আক্ষেপ করছিল।

ও তো এমন কখনও করে না। হুইসকির সঙ্গে বিয়ার মিশিয়ে খেয়েছে। কাঁচা পেঁয়াজ কচ কচ করে খাচ্ছে। কিরণদাও শেষ পর্যন্ত ভয়ে পালিয়েছিল। নিস্তেজ হয়ে পড়েছিল কিছুক্ষণ— তারপরই বমি শুরু।

ওর এক কথা।

তোমরা পার। আমিও পারি।

জ্বালা ভিতরে। অপমান। অথবা অসম্মান কিংবা কোনও অতীতের ঘাস ফুল মাটির ঘ্রাণের জন্য কি ছোড়দি ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল!

হাত দুটো তোর এত ঠাণ্ডা থাকে কেন কাঞ্চন? হাত দুটো গরম রাখতে পারিস না!

কী করে রাখব জানি না ছোড়দি। এটাই আমার বোধহয় অসুখ। হাত পা ঠাণ্ডা। একটু শীতেই কাবু। কিছুতেই গরম হয় না। তোমার ঘরটায় ঢুকেও বরফের মতো ঠাণ্ডা বোধ করছি।

তুই তো নক্ষত্র চিনিস।

কোন নক্ষত্র।

কত নক্ষত্র। তোর কবিতায় এত নক্ষত্র থাকে। হাতে থাকে না কেন।

হাতে থাকলে কী হবে।

শীতল হাত নক্ষত্রের ছোঁয়ায় গরম হতে পারে। চেষ্টা করেছিস!

না ছোড়দি।

সারাদিন কিছু খাসনি কেন?

খেয়েছি। সুধীনের সঙ্গে দেখা। সে আমাকে চা টোস্ট খাইয়েছে।

কখন বের হয়েছিস বাড়ি থেকে।

সকালে।

সারাদিন কোথায় ছিলি।

কিরণদার বাড়ি। দুপুরে খেতে বলেছিল। বাণী এখন বড় হয়ে গেছে।

টের পেয়েছিস।

ওর তো চুলে জড়ানো দিল—বাণী আগের বাণী আছে কী নেই, বাণী তার চুলে জড়ানো তোয়ালেটা দিল —আমার যে কী হয়। বাথরুমে ঢুকে স্নানের কথা মনেই থাকল না। তোয়ালের গন্ধে টের পাই কি না। বাণী তো চায় আমি তাকে যেন বোঝার চেষ্টা

করি। না হলে বলো, চুলে জড়ানো তোয়ালেটা দিল কেন! অন্য তোয়ালে দিলে কত ভাল হত বল। ওর ক্লাস কোরের জীবন চার বছর বাদে একরকম আছে কি নেই—বুঝলে ভীষণ পরীক্ষা। বাথরুমে তোয়ালে শুঁকে শুঁকে—

থাক থাক।

ছোড়দি আমার অন্যায় হয়েছে।

গন্ধ শুঁকে খাওয়ার কথা ভুলে গেলি!

থাম থাম। নোংরা নষ্ট। গন্ধ! দুর্গন্ধ। অক অক।

ছোড়দি ছুটে গেল বেসিনে। ছোড়দির বমি পাচ্ছে। অক অক করছে। সে হাঁদাপুরুষ দাঁড়িয়ে। সীতেশ নীচ থেকে ছুটে এসেছে। তাস খেলছিল, না আড্ডা দিচ্ছিল কাঞ্চন জানে না।

কী হল। ছোড়দিকে জাপটে ধরে আছে। পড়ে না যায়। কাঞ্চন পাখাটা আন। হাওয়া কর।

লোডশেডিং থাকে। ঘরে পাখাও থাকে। তবে ছাদের একটা দিক খোলা। ঝিলের খোলা বাতাসে ঘরের সব উড়িয়ে নেয়— সে পাখা খুঁজছে।

তখনই কাঞ্চন দেখল, ছোড়দি বলছে, আমার কিছু হয়নি। ছাড়ো। বমি পাচ্ছে না। সীতেশ নীচে গিয়ে দ্যাখো না, রাধহরি কী করছে!

সীতেশদা নীচে নেমে যাবার আগে কাঞ্চন বলল, শোও ছোড়দি। তোমার বিশ্রামের দরকার।

ফুল স্পিডে পাখা চালিয়ে কাঞ্চন চিন্তিত মুখে শিয়রে বসল। কাঞ্চন বলল, সীতেশদা আমি বরং যাই। সাইকেলটা থাকুক। শেষ বাস পেয়ে যাব মনে হয়।

না, যাবি না। আমার কিছু হয়নি। তুমি যাও। রাধহরিকে বলো, উপরে যেন আমাদের খাবার দিয়ে যায়। সীতেশ ছাড়া পেয়ে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। সনৎবাবুরা তাস নিয়ে বসে আছে। তাসের নেশা তার প্রবল। কাঞ্চন কিছুটা সংকোচের সঙ্গে বলল, ছোড়দি, শুয়ে থাকো। ওঠো না। খেতে পারবে না। চুপচাপ শুয়ে থাক। শরীর ঠিক হলে খাবে।

আমার খিদে পেয়েছে।

এই যে বেসিনে ছুটে গেলে!

যাব না! মেয়েদের শরীর বড় হলে কী কী হয় কিছু জানিস!

সে জানে, আবার জানেও না। চুপ করে থাকল। লেবার রুমে সে দেখেছে। ভূমিষ্ঠ হয় সন্তান। 'জরায়ুর উত্তাপ প্রবল হলে বসুন্ধরা বায়ু বহন করে। বীজ বপণে চাষী লাঙল কাঁধে মাঠে—চাষ আবাদ এবং আগাছা সব সমূলে বিনষ্ট। বীজ বপণে চাষী যায় মাঠে। লক্ষ ফলে।'

এইসব অনুষঙ্গ মাথার মধ্যে ক্রিয়া করলে সে আরও নির্বোধ হয়ে যায়। 'নলিনী তার উরুমূলের বিস্তার, নদীর চরার মতো বন জঙ্গলে ঢাকা এবং কোনও বালুকাবেলায় তরুণীর দুই স্তন আর নিতম্ব মসৃণ—' এ-সব অনুষঙ্গও সে টের পায়। আর টের পেলেই নির্বোধের মতো তার আচরণ—শিশুর মতো পেচ্ছাপের আগ্রহ জন্মায় বারবার।

কী রে চুপ করে আছিস কেন। বল কী কী হয়। মেয়েরা বড় হলে কী হয় বল!

ছোড়দি। বড়ই কাতর চোখে ছোড়দির দিকে সে তাকাল।

কাল এলি না কেন!

শরীরটা ভাল ছিল না।

তোর শরীর কবে ভাল থাকে! কেন ভাল থাকে না, ভেবে দেখেছিস!

না ভাবিনি। তবে হেলথ সেন্টারে থাকলে হাওয়া বাতাসে ঈশ্বর উড়ে! রোজ রোজ ধরাধরি করে গর্ভবতী রমণীদের নিয়ে যাবার সময় আমার কেমন বিশ্রী লাগে। এই যাচ্ছে। এই মানে, খুবই অশ্লীল—

তারপর আবার চুপ।

এই মানেটা কী বল! চুপ করে থাকলি কেন!

আচ্ছা ক্ষুরে কী ধার! না ছোড়দি।

ক্ষুর আসে কোত্থেকে!

সে যে কী বলে! লেবার রুমে কী হয় সব তো সে জানে। পালিয়ে একবার না, মাকে খুঁজতে গিয়ে বারবার—কারণ তার মনে হত,মা না তার হারিয়ে যায়। ডিউটিতে গেলেই সে কান্নাকাটি শুরু করত। আট দশ বছর বয়সেও পূজন মাসি কোলে নিয়ে বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকত। মা ডিউটিতে যাচ্ছে। হাসপাতালের ভিতরে ঢুকে গেলে আর দেখা যেত না। হাহাকার ছিল ভিতরে। এই এক আতঙ্ক থেকেই সে তার মাকে খুঁজতে চুপি চুপি ঘর থেকে বের হয়ে মাঠে চলে যেত। তারপর এক দৌড়ে বারান্দায় উঠে এ-ঘর সে-ঘর করত। ফার্মাসিস্টবাবু, গ্রাম সেবিকারা তাকে কোলে নিয়ে আদর করতে চাইত। কাউকে সে বিশ্বাস করত না। তার মনে হত, মাকে তারা ইচ্ছে করেই লুকিয়ে রাখতে চায়। মার কাছে তারা তাকে যেতে দিতে চায় না। হিরা মাসি একবার ক্ষুরে কেন ধার দিচ্ছিল সে জানে না। ক্ষুর দিয়ে কী হয়! মাসি তাকে দেখেই চেপে ধরেছিল। আবার তুই। দাঁড়া দেখাচ্ছি মজা। ওকে জাপটে ধরে প্যান্ট টেনে খুলে ফেলছিল। সে দাপাদাপি করেও ছাড়া পায়নি। কান্নাকাটি করলে মালিনী মাসি ছুটে এসে কোলে তুলে নিয়েছিল। ক্ষুর দিয়ে তার কী সব কেটে দেবে বলছিল।

হিরামাসির কপট রাগ, তোদের জ্বালায় একটা পেটও খালি থাকে না। আসছে তো আসছেই।

কী রে ক্ষুরের কথা বলছিস কেন! ক্ষুরের ধার নিয়ে তোর এত চিন্তা কেন! তোর কি মাথা খারাপ আছে! যতসব অসংলগ্ন কথাবার্তা।

সেই। মাথাটায় কোনও গণ্ডগোল আছে ছোড়দি।

তা থাক। থাকা ভাল। শরীর তুই বুঝিস না তবে।

বুঝি। জান ভয় করে।

ভয় কেন!

কী বিশাল চরা! আর বনজঙ্গল।

কাঞ্চন!

ছোড়দি আমাকে ক্ষমা করে দাও। আর বলছি না। খুব খারাপ কথা। ছোড়দি আমার শরীর কেমন ঘোলাচ্ছে।

তুই এত ভীরু স্বভাবের কেন বল তো। দেখি তোর হাত দুটো।

সে তার হাতের দিকে তাকাল। হাত দুটো এগিয়ে দিতে সাহস পাচ্ছে না। এমন বরফের মতো ঠাণ্ডা হাত ছুঁলেও সর্দিকাশি হতে পারে। সে হাত মুঠো করল, ফের আঙুলগুলো ছড়িয়ে দিল। কিছুক্ষণ এ-ভাবে হাতের এবং আঙুলের ব্যায়ামে সে দেখেছে, হাতে ততটা ঠাণ্ডাভাব থাকে না।

দেখি না।

বলে উঠে বসল ছোড়দি। তার পাশে বসল। ইজিচেয়ারে কবিতার বই। বইটি তুলে যথাস্থানে রেখে হাত ছড়িয়ে দিল বিছানায়। বলল, হাতে হাত রাখ।

সে কেমন কাঁপছে।

হাত রাখ।

সে কোনওরকমে একটা হাত রাখল।

ছোড়দি দু হাতে ঘষছে। উত্তপ্ত করার চেষ্টা করছে। বলছে, হাত ঘষতেও শিখতে হয়। কে তোকে শেখাবে। তোর যে কী হবে! এত নক্ষত্র থাকে কবিতায় তোর, দুটো নক্ষত্র পেড়ে আনতে পারিস না। হাতে মুঠো করে নক্ষত্র দুটি চেপে রাখতে পারিস না। চেপে রাখলেই দেখবি হাত পা শরীর তোর সব গরম হয়ে যাবে। শরীরে শীত থাকবে না। নিজেকে আড়াল করার চেষ্টা থাকবে না। স্বাভাবিক হয়ে যাবি।

ছোড়দির কথায় সে চোখ বুজে ফেলল।

চোখ বুজে আছিস কেন?

চেষ্টা করছি। দেখি পারি কি না।

কী পারিস কি না।

নক্ষত্র চুরি করতে পারি কি না। চুরি করে মুঠোর মধ্যে লুকিয়ে রাখব। শরীর গরম যদি হয়।

রাখহরি উপরে খাবার নিয়ে হাজির।

টেবিল না সাজিয়েই খাবার হাজির করলি! দাঁড়া। রাখ ওদিকে। টেবিল থেকে বইখাতা সব নামা।

সাদা চাদর পেতে দে।

ছোড়দি দাঁড়িয়ে আছে। রাখহরি বই খাতা নামালে ছোড়দি একদিকে, রাখহরি একদিকে।

ছোড়দি সরো তো।

কাঞ্চন টেবিল ধরার জন্য এগিয়ে গেল। ছোড়দি বাধা দিল না। কখনও কোনও কাজই আগ বাড়িয়ে কাঞ্চন করে না। শোভন অশোভনও ভাল বোঝে না। সব সময় কোনও এক অলৌকিক জগতে যেন বিচরণ করে বেড়ায়। কোথাও নিয়ে গেলে দেখেছে, একা থাকতে পছন্দ করে। একা ঘুরতে পছন্দ করে। কোনও বড় গাছের ছায়া পেলে বালকের মতো উচ্ছল হয়ে ওঠে। অথচ কবিতাপাঠের সময় ফুলদানির রজনীগন্ধা উল্টে গেলেও ফুলদানি সে তোলে না। হাতের কাছে থাকলেও না। জলে জামা কাপড় নষ্ট হলেও না। কেউ করবে। কবিতার কোনও সূর্যমুখী তাকে যেন সব সময় স্পর্শ করে থাকে।

সেই কাঞ্চন ছোড়দিকে সরিয়ে টেবিল পাখার তলায় নিয়ে আসায় বোধবুদ্ধির প্রসার ঘটছে ভেবে খুব খুশি।

বড় চিনেমাটির পাত্রে ঢাকা ভাত। এক জগ জল কাচের পাত্রে।

কাঞ্চন সাদা চাদরটাও সুন্দর করে বিছিয়ে দিল।

তোর শীত করছে না তো।

কিছুটা উপহাসের ভঙ্গি ছোড়দির। যদিও ফাল্গুন শেষ—তবু এখনও ভোররাতের দিকে বেশ ঠাণ্ডা। ঝিলের পারে বাড়ি বলে, সূর্য অস্ত গেলেই ঠাণ্ডা হাওয়া উঠে আসে।

কাঞ্চনের হাত পা যা ঠাণ্ডা তাতে চাদর গায়ে রাখা স্বাভাবিক। সে নিজেও পাতলা চাদর গায়ে রেখেছে। যেন নক্ষত্রের খবর দিয়ে ছোড়দি নিজেও শীতকাতুরে হয়ে গেছে। কিছুটা বেকুব। ঘোরের মাথায় বলেছে। স্বাভাবিক থাকলে কিছুতেই বলতে পারত না। যদি টের পায় সেই নক্ষত্র জীবনের সুধা বহন করে, সব কিছু তুচ্ছ করতে শেখায়, তবে সে যে খুব খোলামেলা হয়ে যাবে। খোলামেলা হয়ে গেলে ছোড়দির উপর তার অগাধ বিশ্বাসে চিড় ধরতে পারে। সে সহজেই এ বাড়িতে থেকে যায়। সহজেই যখন তখন তার ঘরে ঢুকে যায়। প্রিয় বন্ধুর কাছে আসা তার। তার বেশি কিছু সে বোধহয় এখনও বোঝে না। সকালে কিরণদার বাড়ি গেছে, কিছুটা অস্বস্তি ছিল তার। ছোড়দিকে মুখ দেখাবে কী করে। সে অসুস্থ হয়ে না পড়লে তার কতদিন পাত্তা পাওয়া যেত না তাও ঠিকঠাক বলা অসম্ভব।

সীতেশ উপরে উঠে অবাক।

মিঠু বেশ চানটান করে ফ্রেস হয়ে বের হয়েছে। ঠিক চানটান নয়, গা ধোওয়া। ঠাণ্ডা আছে। চাদরও গায়ে আছে, তবু রোজকার অভ্যাস আজও রক্ষা করেছে।

তোর ক্ষমতা আছে কাঞ্চন। কাল রাতে তোর ছোড়দি যা করল! কবিতা পড়ে কাউকে সুস্থ করে তোলা যায় তা হলে।

কী আরম্ভ করেছ বল তো। বসে যাও।

আজ রান্নার মেনু কী সে জানে না। সীতেশই নিজের পছন্দ মতো রাখহরিকে দিয়ে করিয়ে রেখেছে। সে ঢাকনা খুলে দেখছে। এত রকম—কাঞ্চন থাকতে রাজি হয়েছে বলে, না মুখে অরুচি—কোনটা ভাল লেগে যাবে এ সব ভেবে সীতেশ এত আয়োজন করেছে।

না ছোড়দি। আর দেবে না। পারব না।

এক চামচ—এই খাবি। সারারাত এটুকু খেয়ে থাকা যায় না। চুপ কর বলছি। কোনও কথা শুনছি না। মাছ ভাজা, মুগের ডাল। ডাল দিয়ে ভাত মেখে নে। মাখ ভাল করে। এ কী দু আঙুলে নাড়াচাড়া করছিস। আর আঙুলে কি তোর জোর নেই। মেখে দেব।

না না।

সহসা কেন যে ফের ওক উঠে এল ছোড়দির। বেসিনের দিকে যেতে যেতে থেমে গেল। কুৎসিত, এত কুৎসিত খাওয়া!

কাঞ্চনের খাওয়া মাথায় উঠে গেছে। মেয়েদের হাঁচি কাশি শুনতে লজ্জা পায় সে। হাঁচি কাশি ছাড়া মেয়েদের আর কিছু তার অশ্লীল মনে হয় না। বমি করে ভাসালেও অশ্লীল। ছোড়দির বমির উদ্রেক হচ্ছে। মেয়েদের এতে কতটা খারাপ দেখায় ছোড়দি বুঝবে না। অসুন্দর হলে ছোড়দি যে সব তার গরিমা হারিয়ে ফেলবে।

ছোড়দি বিছানার দিকে হেঁটে যাচ্ছে।

কী হল আবার।

ওকে ঠিকমতো ডাল মেখে খেতে বলো। সীতেশ, অমন কুৎসিত খাওয়া দেখলে আমার সহ্য হয় না। খেতে ইচ্ছে হয় না। ও বোঝে!

যাক ছোড়দি রক্ষা পেয়ে গেছে। বেসিন পর্যন্ত গিয়েছে, বমি করেনি। বমি করলে তারও ওক উঠে আসত। খাওয়ার স্পৃহা একদম থাকত না। একটা সুন্দর রজনীগন্ধার উপর কাকে বসে হেগেমুতে দিলে যা হয় ছোড়দিও তা হয়ে যেত। ছোড়দির মতো

মেয়েদের বমি পেতে পারে এটাই সে বিশ্বাস করতে পারে না। বিশ্বাসের মর্যাদা রাখার জন্য সে বেশ কিছুটা ভাত ডাল দিয়ে মেখে নিল। কইমাছ ভাজা—আস্ত।

ঠিক হচ্ছে না ?

ছোড়দি পাতে নুন দিল।

নুন মাখিসনি। হবে কী করে ?

ছোড়দি সব লক্ষ রাখছে। পাশে খেতে বসে গেছে সীতেশদাও। তাস খেলায় টাকা পয়সা বাজি রেখে সীতেশদারা খেলে। পাশে গ্লাস থাকে। কেউ ওদের একজন নিয়ে আসে। সীতেশদার দেরি করলে চলবে না। কে কী খাচ্ছে তাও দেখছে না। কাঞ্চন যখন আছে ছোড়দি নিঃসঙ্গও বোধ করবে না।

এই পেট ভরে খাস। ভাত চটকে মাখ। না চটকালে গিলবি কী করে। আমি উঠছি। ভাত চটকাতে শিখতে হয়। তবে তো খাওয়া।

হয়ে গেল তোমার।

কাঞ্চন অবাক। সীতেশদা দ্রুত খায়। পাতে কিছু পড়লে খালি থাকে না। নিমেষে শেষ। তারিয়ে তারিয়ে খাওয়াটা সীতেশদা জানে না। কবিতা সম্মেলনে, কমিউনিটি ডাইনিং-এ দেখেছে, সীতেশদা খেতে বসলেই বিরক্ত। পাতে পড়তে না পড়তেই শেষ। একটু গল্পগুজব করে খাওয়া সীতেশদার ধাতে নেই। সীতেশদা সিঁড়ি ধরে নেমে গেল।

এ কী, বসে থাকলে কেন। আরম্ভ করো। খাও ছোড়দি।

ছোড়দি তার মতো খুব হাল্কা করে ভাত ভাঙছে। কাঞ্চন অবাক। সে এভাবে ভাত ভাঙলে ছোড়দির বমি পায় আর নিজে গুনে গুনে যেন ভাত আলগা করছে। অবশ্য মেয়েদের এভাবে ভাত ভাঙা, খুব সামান্য কটা ভাত মুখে তোলা—রুচিবোধের মধ্যে পড়ে যায়। ছোড়দি নিজে নিচ্ছে, তাকেও দিচ্ছে।

না মাছ আর দেবে না।

দিলাম কোথায় !

ছোড়দি হজম হবে না।

খুব হবে। খা তো। কিছু ফেলেছিস তো আবার আমার বমি পাবে।

রক্ষে করো ছোড়দি। আর যাই করো বমি করো না। বমি করলে তোমাকে বড় অসুন্দর লাগবে।

তবে মাছটা খা।

পুরো মাছটা !

হ্যাঁ পুরো মাছটা। খেতে শেখ। কেবল অসুখের বাহানা।

সঙ্গে সঙ্গে কাঞ্চন একটা কৌটা বের করে হাতে কী ঢেলে নিতেই খপ করে ধরে ফেলল ছোড়দি।

কী খাচ্ছিস !

ওষুধ।

কিসের ওষুধ !

হজমের।

প্রায় থাবড়া মেরে ওষুধটা হাত থেকে ফেলে দিল।

তোর ওষুধ খাওয়া বের করছি। এত ভয়ে মরিস। কী খেয়েছিস। সারাদিন পেটে কিছু পড়েনি। একটা আস্ত মাছ খেতে পারিস না। তাজা মাছ। কইমাছ ঝিল থেকে

তুলে দিয়ে গেছে। খা। মাছ মুখে দে। মাছ বেছে দিচ্ছি।

আমি পারব।

পারবি তো মাছ মুখে দিচ্ছিস না কেন। প্রায় হাত ঠেলে সরিয়ে দিয়ে মাছটা বেছে দিয়ে বলল, খা, কাঁটা নেই। গলায় ঠেকবে না। ঠেকলে আমি আছি।

কাঞ্চন এতটা কখনও খায়নি। তার সঙ্গে অনেকেই অনেক জায়গায় যায়, তার খাওয়ার বিড়ম্বনার কথা জেনে কখনও আলাদা ব্যবস্থাও হয়। ছোড়দির ক্ষোভ তখন—একটা কথা বলে না। স্টেশনে গাড়ি এলে শুধু নজর রাখে। সে উঠল কি না। সবাই না উঠলে গাড়িতেও সে আগে ওঠে না।

মাথাটা এবার মুখে দে।

কাঁটা।

হোক কাঁটা। দে মুখে।

কী জানি, যদি ছোড়দির বমি পায়, ভেবেই খুব সতর্ক ভাবে মাছের মাথা হাতে নিয়ে নড়াচড়া করল, মুখে দিচ্ছে না।

ছোড়দি বলল, মাথাটায় সামান্য নুন দিয়ে খা। দেখ না আমি খাচ্ছি। ছোড়দি কত অনায়াসে কই মাছের মাথা সামান্য নুনে চুবিয়ে তারিয়ে তারিয়ে খাচ্ছে।

ছোড়দির তারিয়ে তারিয়ে খাওয়া দেখে স্পৃহা জন্মাল তার। মুখে মুণ্ডু ঢুকিয়ে আঙুলে নুন নিল। মুখে দিল, ছোড়দির কী তৃপ্তি এই খাওয়ায়। সারা মুখে যেন খাওয়ার সুষমা ছড়িয়ে পড়ছে। তারপর সে দুটো মিষ্টিও খেল। ছোড়দি বলল, বেশ তো খেতে পারিস।

সে একটা বড় ঢেকুর তুলতে গিয়েও নিজেকে সংযত করল। উদগার তুললে অসভ্যতা, ছোড়দি কী না ভাববে! তার এবার শরীরে নানাবিধ ক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে। তাড়াতাড়ি মুখ ধুয়ে বাথরুমে ঢুকে কল খুলে দিল। এবং বাথরুম থেকে সে বের হল ফ্রেশ হয়ে।

খুব হালকা লাগছে ছোড়দি।

কোনও অস্বস্তি হচ্ছে না তো।

একদম না।

চল ছাদে বসি।

সামনে খোলা ছাদ। তারপর গাছপালা পার হয়ে ঝিল। ঝিলের জলে ঢেউ উঠছে। হাওয়া দিচ্ছিল। চুল উড়ছে ছোড়দির। আঁচল খসে পড়ছে।

হঠাৎ ছোড়দি বলল, তোর নামযশ হলে আমার কত গর্ব জানিস। সীতেশেরও। কিরণদার তো কথাই নেই। যেখানে যাব তোকে নিয়ে আলোচনা হবে। বলবে ওই যে কাঞ্চন নিয়োগী—তুই রাস্তায় হেঁটে গেলে লোক দেখবে। আমাদের তুই কত বড় আশা। আমাদের শহরের। জেলার তুই গর্ব।

আর রাতে সহসা অন্ধকারে কাঞ্চনের মনে হল, কেউ তার বুকে ধীরে ধীরে হাত রেখেছে। আশ্চর্য সুবাসে ঘর ভরে গেছে।

সে জানে, ছোড়দি। ছোড়দি ছাড়া এত রাতে কেউ তার ঘরে আসতে সাহস পাবে না। ছোড়দি কী চায়!

সে উঠে বসল।

ছোড়দির গলা।

দেখছিলাম, তোর হাত-পা গরম আছে কি না। বলেই আলোটা জ্বেলে দিতেই অবাক। কাঞ্চন আতঙ্কে টেবিলের এক কোনায় দেয়ালে ঠেস দিয়ে মুখ গুঁজে দিয়েছে। শামুকের মতো গুটিয়ে গেছে। আতঙ্কে চোখ মুখ কেমন অস্থির।

আলোটা নিভিয়ে দিচ্ছি। শুয়ে পড়। কিচ্ছু করব না। শুধু পাশে একটু জায়গা দে। শুই। ও খুব জ্বালাচ্ছে। ঘুমাতে দিচ্ছে না। মাতাল। কাছে থাকলেই সারারাত জ্বালাবে। না থাকলে ঘুমিয়ে পড়বে।

॥ ৭ ॥

একজন সাধুর পূর্ব কাহিনী—দুই।

এবারে দশ পৃষ্ঠা নয়। পুরো বিশ পৃষ্ঠা।

শুরু এইভাবে।

কিরণ এক গ্লাস জল খেয়ে বলল, তা হলে শুরু করা যাক।

ঘোলা জলের মতো গভীর কুয়াশা সুন্দর মাঠটায় স্থির হয়ে আছে। কীটপতঙ্গের আওয়াজ শোনা যায় কান পাতলে। সেই আবছা ঘোলাটে অন্ধকারের মধ্যে তিরতির করে কাঁপছে কিছু। দূর থেকে দেখলে মনে হয় কিছু পোকামাকড় হাঁটছে।

আদিগন্ত ভরাট জমি। শুখা মাঠ। খরায় জ্বলে পুড়ে গেছে সব। শীতের কামড়ে গাছপালা মাঠ কীটপতঙ্গ অসাড়। মাথার উপর নীল আকাশ। নৈঃশব্দ্য—অশেষ নির্জনতা আর কিছু আগুনের ফুলকি উড়ছে নক্ষত্র হয়ে মাঠের মাথায়। শেষ রাত। দূরে মিলের বাঁশি বাজে। ঘাস পাতা কুয়াশায় ভিজছে।

আর একটু জোরে পড়। সীতেশ পা তুলে দিল টুলে। ছোড়দি খুবই মগ্ন।

শীতে পোকামাকড়ও ওম চায়। ওদের তাও ছিল না। শুধু হেঁটে প্রমাণ করছে ওরা বেঁচে আছে। রক্তে ওম ধরাতে হয়। না হলে বাঁচা যায় না। ঠাণ্ডায় কাবু হয়ে মাঠের মধ্যে পড়ে থাকার কথা। দেখলে মনে হবে শুধু আত্মরক্ষার্থে পায়ে পায়ে দঙ্গল বেঁধে তারা ছুটছে। সূচের মতো কনকনে ঠাণ্ডায় হাত পা অবশ।

তবু ওরা হাঁটছিল। ওদের হুঁশ কম। গরিব মানুষের বেশি হুঁশ থাকা ভাল না। কথাবার্তা বলছিল। কথাবার্তা বললে, ওরা বেঁচে আছে বুঝতে পারে। অন্ধকারে ভূতের মতো ভেসে যাচ্ছে বাতাসে। কিংবা দূর থেকে মনে হয় ক্ষুধার্ত পঙ্গপাল বের হয়েছে কোনও সবুজ শস্যক্ষেত্রের খোঁজে।

সকাল হয়ে আসছে। পাতলা কাঁসার রঙে রাঙানো কোনও সেলুলয়েডে ভেসে ওঠা দিগন্তের অস্পষ্ট ছবি। খুব সতর্ক নজর রাখলে বোঝা যায় ওরা বড় রাস্তায় উঠে যাবার জন্য মাঠ ভাঙছে। প্রথমে মনে হয় পোকামাকড় নড়েচড়ে বেড়াচ্ছে। পরে মনে হয় সারি সারি কাঁকড়া হেঁটে যাচ্ছে। আরও পরে কিঞ্চিৎ মানুষের অবয়ব পায়—যত সকাল হয়ে আসে তত বোঝা যায় তারা বড় রাস্তার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

কীটপতঙ্গ থেকে ধীরে ধীরে যখন মানুষের অবয়ব হয়ে যায় তখন বুঝতে দেরি হয় না এই সেই তারকপুরের ভুখা মানুষের মিছিল—স্টেশনে ট্রেন ধরবে বলে ছুটছে।

ধিরুর মা, কপিলার বউ, পোয়াতি ফুল্লরা, ষষ্ঠীর বিধবা দিদি শ্যামার ঝাঁক এটা। রাত কাবার না হতেই বড় রাস্তায় উঠতে হয়।

শ্যামার নাক চোখ বড় টান টান। শ্যামলা রঙ। লম্বা, মাজা সরু এবং মরদ মচকানো হম্বিতম্বি প্রবল। এর জন্য আয় তার দু পয়সা বেশি। সে যেমন একখানা গায়ের জামা কিনতে পারে তেমনি নীচের জামাও থাকে তার।

শ্যামা আগে। পেছনে ঝাঁকের কই ফুল্লরা কোকিলারা। বিপদে আপদে শ্যামার মরদ মচকানো হম্বিতে সব তেজ জল। তোয়াজও কম না। মিলের ভেঁপো শুনে ওরা বোঝে রাত পোহাতে কত বাকি। পয়লা ভেঁপো বেজে গেছে। দোসরা ভেঁপো বাজবে। তার আগেই রেলতলির মোড়ে পৌঁছনো দরকার। কারণ তিসরা ভেঁপোতে বড় ভীতির সংকেত থাকে। পাড়ি ফেল। হাঁটান দাও জোরে। পায়ে বল লাগাও। কিরণ বলল, হ্যাঁরে কাঞ্চন, এটা কীরে? শব্দটা ঠিক পড়তে পারছিল না কিরণ। খাতাটা এগিয়ে দিয়েছে। কাঞ্চন সামান্য হামা দিয়ে দেখল। তারপর বলল—নসিপুর। নসিপুর থেকে ট্রেন ছাড়লেই ওরা দৌড়োতে থাকে। বগলে বস্তার পুঁটুলি। যে যার বগল নিয়ে পড়িমড়ি হেঁটে।

পড়িমড়ি করে হাঁটার সময়, গনুদার জন্য একটা টাকা আলাদা করে রাখতে হয়। টিকিটবাবু, গনুদা তোলা নেয়। সে না থাকলে, আরও কেউ থাকে। শ্যামা ইস্টিশনে গেলেই জানতে পারে। সবার এই তোলা, টাকা পাঁচসিকেয় কত হয়ে যায়। বড়বাবু থেকে ছোটবাবু সবার ভাগ থাকে। গনুদা না থাকলে বিনা ভাড়ায় কে ব্যবস্থা করে কার।

রেলতলির মোড়ে সাধুখাঁর দোকানে এক কাপ চা খাবার সময়, শরীর আলগা করে নিতে পারে। নসিপুরে সিগন্যাল ডাউন হয়নি। চাও খায়, গল্পগুজবও করে।

সাধুখাঁর তখন এক কথা—কোথায় ঘর নিকোবি, উঠোন ঝাঁট দিবি, তুলসীতলায় মাথা ঠেকাবি, তা না, চললি বেথুয়াডহরি। দিনের পাড়ি।

ফুল্লরার এক কথা, উদর তো কারও কথা কানে লয় না দাদা! করিডা কী!

এই উদর হল গে গরিব মানুষের বড় সমস্যে। উদর একখানা লয়, দুখানা লয়, যার যেমন উদরের দয় তার ত্যামন ঠ্যালা সামলাতে হয়। কর্তা আমার গাঁজা ভাঙ খেয়ে পড়ে থাকে—ফেরে কখনও। কখন ফেরে না—করি কী কন। ফুল্লরার এই সব আফসোসের কথা সাধুখাঁ ভালই জানে।

সাধুখাঁর আপ্তবাক্য—রাস্তাখান বড় লম্বা। যে যার জায়গা করে নিতে না পারলে পড়ে থাক ইস্টিশনে। ভেঁপো বাজিয়ে গরমেন্টের গাড়ি চলে যাবে। তুমি ধুলায় পইড়ে থাকলে।

মানুষের এই আর একখানা কথা—বসে লয়, নড়াচড়া না করলে কপাল ইট-পাথর। কপালে যে যার মতো তিলক কেটে বের হও—চোর গুণ্ডা সাধু মন্ত্রী সান্ত্রী কেউটে—ফোঁটা একখানা কপালে চাই। যার যেমন হিম্মত। সংসারে পাপও নাই, পুণ্যও নাই। লাইনে এসে শ্যামা ফুল্লরা ভালই বুঝেছে এটা।

ফুল্লরা বোঝে ঠাকুরের কাছে দেহখানা জিম্মা রেখে কী আর হবে। তার উপর শুধু নাচন-কোঁদন—ভাত দেবার মুরদ নাই কিল মারার গোঁসাই। কোকিলা সাহস না দিলে শ্যামার পরামর্শ না শুনলে খরায় জরায় শুকিয়ে কাঠ।

এদের ঝাঁক বেঁধে থাকার স্বভাব। যে যার ঝাঁকে থাকে। ঝাঁক বদল হয়ে গেলে বড় বিড়ম্বনা। কোথাকার কোন পঙ্গপাল যেতে যেতে চেনা হয়ে যায় টিকিটবাবুদের।

ক'জন তোমরা?

আজ্ঞে দু গণ্ডা বাবু। এই নিন।

তোমরা ?

সাতজন।

তোমরা ?

তিন গণ্ডা আর বাড়তি একজন।

এক কামরায় উঠবে না। বাবুরা দ্যাখছ তো রাগ করে। ভাগ ভাগ হয়ে উঠে পড়।

আজ্ঞে ঠিক আছে।

শ্যামার দলে তার সাতজন নারীবাহিনী। শ্যামা সবার কাছ থেকে পয়সা নিয়ে গুনছে। কারণ গাড়ি প্ল্যাটফরমে ঢুকলেই গনুদা দরজায় মুখ বাড়িয়ে দেবে। তার এটা ফাউ রোজগার। চেকারবাবুর লোক—হম্বিতম্বি করতে জানে। পাটিও করে আবার, রেলের চাকাও বন্ধ করে দিতে পারে। ক্ষমতা খর্ব করা কঠিন। একটা গাড়িতে যেতে আসতে কত পয়সা ওঠে। গনুদা পায়। টিকিটবাবুরা পায়, সরকার পায়। ভাগাভাগি করে না খেলে চলবে ক্যানে ?

সংসার এ-ভাবেই চলছে। কড়াকড়িরও শেষ নাই। ঢলাঢলিরও শেষ নাই। খবর হয়ে গেল—গনুদা সংকেত পাঠিয়ে দিল, ধরপাকড় হবে। হড়কে যাও।

ফুল্লরার মনটা বড় তিতা হয়ে যায় সেদিন। বাণিজ্য হল না। বেথুয়াডহরি যাওয়া হল না। হাঁড়ি পাতিল কেনা হল না। পয়সা উপার্জন করা গেল না। আবার খুশিরও শেষ থাকে না। ছুটির দিনে বাড়ি ফিরে গোছগাছ করে রাখা সব। গল্পগুজব সবার সঙ্গে—দলের যারা তারাই মিলে যায়। গাড়ি না থাক, গাছের ছায়া তো আছে। বাণিজ্য গেলেও এই বাড়তি সুখ উপভোগ করার আলাদা মজা।

ফুল্লরাকে নিয়ে নানা কুকথাও ওড়ে। মন্দ স্বভাব ভাবে। ঘরের বার নসিবের মার সমান। ফুল্লরার ক্ষোভের কথা শুনলে, গা জ্বালা করে। —তবে এলি কেন মরতে ! হাত পাত, দেখবি থুথু ছিটাবে। ঘরে যা, দেখবি তেনারা টেনে খাটে তুলবে।

সুতরাং কোনও রেলগাড়ির কামরায় এদের সহবতের অভাব থাকতেই পারে। এরা ঝাঁক বেঁধে ঠেলাঠেলি করে পঙ্গপালের মতো ঢুকে যাবে। বস্তা ছুড়ে ফেলবে জানালা দিয়ে। জায়গা মতো ওঠার জন্য যারা ভদ্রজন তাদের গায়ে হুমড়ি খেয়ে পড়তেই পারে। পরনে শস্তা ডুরে শাড়ি। শ্যামার মতো সবার অঙ্গ ঢাকার জামাও থাকে না। স্তন সম্পর্কে খুব তারা সচেতনও নয়। বুক থেকে শাড়ি পড়ে গেলেও বস্তাখান সামলাতে ব্যস্ত থাকে। আগে বস্তা, পরে স্তন।

যেমন ধরা যাক ফুল্লরার কথা। তার মরদ নারান ঠাকুর তুকতাক, জল-পড়া, বাটি চালান বিদ্যেটি জানে—তবে সংসারের এতে পেট ভরে না। তার পেটের বাচ্চাটা নিয়ে ইদানীং ওর মরদের সন্দ। বাড়ি ফিরে গেলেই দেখতে পায় একটা দণ্ড হাতে নিয়ে বসে আছে। পেটাবে ঠিক করে রেখেছে। আদ্যাশক্তি মহামায়ার সে দাস। সব সে টের পায়। মাথা ঝাঁকাবে আর বলবে, বল কার সঙ্গে পিরিত তর।

কেউ ঝুপড়িটার পাশ দিয়ে গেলেই হাঁকে—ক্যারে !

আরে নারান সাধু যে ! দণ্ড হাতে বসে আছে। বউ লাইনে বুঝি বের হয়ে গেছে !

বউ ! বউ বলো না। দজ্জাল মেয়েছেলে বলো। পিরিতের নাং খুঁজতে গেছে।

নারান বামুন মানুষ। তার সম্মান আলাদা। সে আদ্যাশক্তির উপাসক। খড়ম পায়ে বাড়ি বাড়ি যাবার কথা। বাপ ঠাউরদা তাই করে গেছে। অধমজনকে পুণ্য বিলোবার কথা। সে দিনকালই নেই। বামুন বলে মানে না। বামুনের মুখে আগুন থাকে বিশ্বাস

করে না। সুযোগ পেলে মুখে মুতে দিতেও কসুর করে না। শ্যামা হারামজাদি যত নষ্টের মূলে। তা অভাবে অনটনে টাকা পাঁচসিকা ধার দিতিস বলে বউটাকে ঘরের বার করে নিলি! আর ফিরবে!

আর তার ঘরে মন বসবে!

আদ্যাশক্তির সে উপাসক। তবু পঞ্চুবাবুর কাছে হাতজোড় করে বলেছিল, সরকার তো গরিবজনদের নানারকম সুখ-সুবিধার বন্দোবস্ত করে দিচ্ছে—যদি ঋণের টাকায় সেলাই কল একখানা হয়ে যায়, ফুল্লরা তবে লাইনে বের হয় না।

পঞ্চুবাবু মুখে তার পেশ্চাপ করে দিয়েছে।—তুই বেটা বামুন, তোর আবার সেলাই কল কিসের। অং বং করে পেট চালাতে না পারলে সরকার কি করবে! তোরাই বামুনের জাত মারলি। বাপ ঠাকুরদার ইজ্জত দিলি না। যা ভাগ।

তবু সে রাগ করেনি। কপালে চোখ তুলে অভিশম্পাত করেনি। যদি পঞ্চুবাবুর মন গলে—আপনার পুত্রটির চিঠি আসে না। বউঠান উচাটনে আছে। বলবেন, চিঠি আসবে। নৈঋত কোণে টোকা পুঁতে দিলেই চিঠি হড়হড় করে আসতে শুরু করবে।

পঞ্চুবাবু বলল, এখন যা। দেখি কী করতে পারি।

পঞ্চুবাবু সেই থেকে ঘোরাচ্ছে। পুত্রের চিঠি পেয়ে ডেকে পাঠিয়েছিল—খুশি বউঠান। এক কাঠা চাল, বেগুন, আলুর একটি সিধা হাতে তুলে দিয়ে বলেছিল, তোমার দাদাকে বলে ঋণের বন্দোবস্ত করে দিতে পারি কি না দেখি।

তারপর ভেবেছিল, দেবদেবীর চেয়েও পার্টি বড়। পঞ্চুবাবুর মিছিলে গেলে পাবে। সে দু'বার ঝাণ্ডা হাতে মিছিলে গেছে। ফুল্লরা গেছে। গেনি গেছে। গেনি তার বড় কন্যে। মা বাড়ি থাকে না যার তার কন্যের নজর আর কত বড় হবে! তবু গেনিটা আছে বলে, হাতের কাছে জলটা পায়। একটু বেশি কিছু চাইতে গেলেই, গেনির এক কথা, মা বারণ করে গেছে।

একখানা দে।

না, মা বারণ করে গেছে।

আরে পেটে খিদে থাকলে দিতে হয়। আমি না তর পিতৃদেব।

না, মা বারণ করে গেছে।

খ্যাতা পুড়ি তর মার। দিবি কি না বল!

বলছি না, মা বারণ করে গেছে।

গেনি একখানা বের করে ঠিক। লুকিয়ে বের করে। দেখতে পেলেই খপ করে তুলে নেবে। তারপর ছুটে পালাবে। ছোট ভাই গোলার হাতে একখানা দেয়। নিজে একখানা নেয়। বাবা বারান্দায় বসে হাঁকডাক করে। দরজা বন্ধ করে হাঁড়ি থেকে তুলে তারা খায়। গোনাগুনতি রুটি। সকালের জলখাবার। বাবা নিজেরটা খেয়ে আর একটা খাবে বলে শকুনের মত ঘরের দিকে মাথা বাড়িয়ে দিয়েছে।

দে মা জননী।

না, মা বারণ করে গেছে।

তোর মা কি সতী সাবিত্রী, হারামজাদি মেয়ে? বলে গেছে বলে গেছে করতেছিস! এ কি রামকুণ্ড, দাগের বার হলে সীতা হরণ! দে বলছি। খিদা নিবারণ হচ্ছে না।

হচ্ছে না তো হচ্ছে না। মা বারণ করে গেছে।

সেই থেকে খেপে বসে আছে নারান। শালা ইজ্জত গেল পেট ভরল না। তর এ

কামে আমার কোন আখের ! বলি তুই যদি বেরই হলি, তবে দু-খান আস্ত রুটি রেখে যেতে পারলি না তর পতি দেবতাটির জন্য। পতির পুন্যে সতীর পুন্য তুলে বসে থাকলি। তর পাপ হবে না ! স্বামী মানুষটারে ভুখা রেখে রেলগাড়ি চড়ে চলে গেলি !

আসলে নারানের হয়েছে জ্বালা। পেটে খেলে পিঠে সয়। তার পেটও ভরবে না, বাড়ির বার হয়ে ইজ্জতও নেবে ! দুটো একসঙ্গে হবে না। বউকে জব্দ করার জন্য ফন্দি ফিকিররের কথা ভাবছে। আর লাঠি তুলে বারি মারছে মেঝেতে। লাঠির ভয়ে গেনি গোলা লুকিয়ে আছে জঙ্গলে। নেশা ভাঙ করে ফিরলে মাকেও পেটায়।

নারান চিৎকার করে উঠল।

ভ্রষ্টা ! কুলটা ! পেটে তর সাত মাস না দশ মাস জানি না। ওটা আমার নয়। মেয়েমানুষ তুই যাবি কোথা ! আতঙ্কে মাথা খারাপ না করে ছাড়ছি না। পেটে জারজ সন্তান—যাবি কোথা !

এই একটা তরাস ঢুকিয়ে দিতে পারলে ঠিক লাইনে চলে আসবে। সে যে সংসারে গেনি গোলা নয়, তাদের বাপ, ফুল্লারার স্বামী, স্বীকার করতেই হবে। বলতেই হবে, শত হলেও তিনি তোদের বাপ—সংসারে তাঁর ইজ্জত আলাদা, সে বললে তোরা তার সন্তান, না বললে জারজ—তার পেটে একখানা নয়, দু-খানা, তিনখানা—যত ধরে দিবি। তোনার পেট ভরলে খাবি, না থাকলে বন-জঙ্গলে ঘুরে ফল পাকুড় পাড়বি। পাখ পাখালি দেখবি। বেল আতা কুল কি না আছে—বাপ হয়ে চুরি চামারি করে কী করে ! তোরা ডাঁটো আছিস, এটা ওটা পেড়ে আনলে জেলে দেবে না। তোর বাপ জেলখাটা মানুষ—তরাস থাকতেই পারে।

সে তার হাতের দণ্ডটা নিয়ে উঠে দাঁড়াল। এটিই তার সম্বল। চন্দ্রনাথ থেকে পিতামহ তীর্থ সেরে ফেরার সময় এনেছিলেন। উত্তরাধিকার সূত্রে সে পেয়েছে। দণ্ডে জাদু আছে, গাছ ছুঁলে পাথর, মানুষ ছুঁলে ভেড়া, জল হয় না, মাটি ফুটিফাটা—দাও লাঠি তুলে—আকাশ ফুটো হয়ে গেলে জল ঝরবে, মাটি আর সুখা থাকবে না। তবে দণ্ডটি এখন কাজে আসছে না। মাঝে মাঝে ফুল্লরার পিঠ ছাড়া দণ্ডটির ব্যবহারও নেই।

দাওয়ায় বসে থেকে লাভ নেই। সেই সাঁজবেলায় ফিরবে মা জননী। যা মিলবার মিলে গেছে। গেনি ঝাঁপ ফেলে তালা ঝুলিয়ে দিয়েছে। গোলার হাত ধরে ক্ষেত খামারে ঘুরে বেড়াবে। ঝুড়িতে গোবর কুড়াবে। নারান যে এ বাড়ির অভিভাবক, সে যে এদের জন্মদাতা, কে বলবে। যেন সে একজন ছিচকে চোর। ঘরে ঢোকারও তার সাহস নেই।

দণ্ডটা একবার নিজের মাথায় মারলে কেমন হয়—ঘিলু ফাটিয়ে দেখা কী আছে, কী নেই ! মরচে পড়ে গেছে—না তার আদ্যাশক্তি তাকে বিপাকে ফেলে পালিয়েছে ! না হলে সে তঞ্চকতার দায়ে হাজত খেটে এল—লাঠি তার বশ নয়, আদ্যাশক্তি তার বশ নয়। বশে থাকলে হাজতবাস অসম্ভব। মুখ দেখে, কপাল দেখে বিপদ আপদের আতঙ্ক ধরিয়ে দাও। কার কী দশা চলছে, তার হিসাব না থাকুক, পুঁথির পাতায় লেখা আছে, দশার প্রলয় থেকে আত্মরক্ষা—পাথর ধারণ। গোমেধ, নীলা, হিরা মুক্তা পর্যন্ত দরে উঠে যেত।

গাঁজা ভাঙের নেশা আছে তার। সে অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে তা স্বীকার করে। এটা একটা মহৎ দোষ মানুষের। তা নানা কিসিমের ইন্দ্রিয়াদি অষ্টলোকপালের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার্থে ব্যোম ভোলানাথ না হলে চলে না। মানুষের মঙ্গলের জন্যই সে

গ্রহলোক থেকে আদ্যাশক্তির আরাধনা করে থাকে। সেই নেশার কবলে পড়েই পাথর কেনার নাম করে লুটের পয়সা নিয়ে এসে বাড়িতে মচ্ছব লাগিয়ে দিল। চিন্তাহরণ তার শ্বশুর, তেনারও নেশাভাঙের অভ্যাস, আর আছে কালীপদ আচার্য—কাকতালীয় বিদ্যার সে জাহাজ একখানা—তারই পরামর্শে, কুণ্ডেশ্বরীর পূজা, এতে সিদ্ধিলাভ। আর পাথরের সব টাকাটাই উজার। পরে হাজতবাস। আদালতে মামলা উঠলে বেকসুর খালাস। টাকা তো আর সাক্ষীসাবুদ রেখে নেয়নি ?

ফুল্লরা কিছুতেই বোঝে না।

দণ্ড না ভণ্ড ! দাগি আসামির ঘর করি। কোনওদিন না গলা টিপে মেরে ফেলে।

পরিবারই বিশ্বাস করে না। লোকে করবে কেন ! প্রতারক, ঠকবাজ, মারধোরও খেল। তার দিন বড় খারাপ।

এখন চেনাজানা লোক ভাবে সে ফেরেবাজ মানুষ। তার হাসি পায়। ঘর বাড়ি ইমারত সব ধান্দাবাজির ফসল। কোন শালা ফেরব্বাজ নয় ! মানুষের ইমান থাকলে, কেউ খায়, কেউ খায় না, হয় না। কেউ মচ্ছব লাগায়, আর কেউ পাত ধুয়ে বসে থাকে ! শালা গোটা দুনিয়াটা টিকরমবাজদের পাল্লায় পড়ে দোদুল্যমান। সে সরল গোবেচারা মানুষ, হাজতবাস তার হবে না তো কার হবে !

সে হাঁটতে থাকল। তার অনেকদিনের বাসনা, একটা থান খুলবে নিমগাছটার নীচে। সাধুসন্তরা বড় পূজা পায়। তার তো কিছু গুপ্তবিদ্যা জানাই আছে। কপাল দেখে মুখ দেখে, কিছুটা আঁচ করে নাও, রোগব্যাধি দুর্ঘটনা, লাম্পট্য সবই মানুষের স্বভাবে থাকে। আস্তে টোকা মারো। দেখবে গড় গড় করে বলে দেবে সব।

বামুনের বেটা সে। গ্রহপূজা থেকে শান্তি স্বস্ত্যয়নে সে পারদর্শী। স্বপ্নাদ্য ওষুধ তার আছে। এমন সব জাতের এঁটুলি পোকা তাকে কামড়ায়। দণ্ড আর আদ্যাশক্তির আশাতেই সে আর জন খাটে না। জন খাটলে বাপ পিতামহের কুল যায়। ফুলি সেটা বোঝে না। —বামুনের ব্যাটা রে ! খেতে দেবার মুরদ নেই, বামুনের ব্যাটা সেজে বসে থাক ! চললাম।

আরে যাবি কোথায় ! দ্যাখ না খেলাটা কী খেলি ! চোখের উপর দেখতে পাস না সিংহিবাবুদের রমরমা। কুণ্ডেশ্বরী দেবীর নামে কী একখানা ব্যবসা ফাঁদলেন। পৌষ মাসে শনিবার মঙ্গলবারে মেলা—হাজার লক্ষ লোক, রাশি রাশি পাঁঠাবলি। মন্দিরে পয়সার হরিরলুট। কত লোক হত্যে দিচ্ছে। বিলের জলে ডুব দিচ্ছে। বটগাছে মাটির ঘড়া বাঁধছে। চুল চেঁচে ফেলে দিচ্ছে। যার যা মানত। হিরার নথ সোনার বালা। কোথায় যায় সব !

কিন্তু ফুল্লরা কিছুই শুনতে রাজি না।

হিম্মত আছে ! যা রোজগার করো, নেশাভাঙে উড়িয়ে দাও। হাত ছাড়ো।

সে একবার ভাবল গকুল দাসের আরতে গেলে হয়। বামুনের বেটা বলে গকুল দাস তার দাম দেয়। দেবদ্বিজে ভক্তি আছে। অন্তত এক কাপ চা মিলে গেলেও যেতে পারে। গোপনে অবশ্য বলে কুলাঙ্গার। তার দণ্ড কিংবা আদ্যাশক্তির ভেক কাজে আসছে না। বড় আফসোস। তা কুলাঙ্গার না হলে রাস্তাটা আমার আর কী জানা আছে বল !

বউ যার রেলগাড়ি চড়ে বেড়ায়, বউ-এর রোজগারে যার উদরপূর্তি তার স্বভাব ট্যারা হবে না তো কার হবে। পরনের খুঁটখানা খুলে যাচ্ছিল নারানের। সেটা সে মোচড় দিয়ে

খালি পেটে গুঁজে দিল। রোগা, দুবলা মানুষ—হাড় কখানা সম্বল। পূর্ণিতে ক' গাছা দাড়ি বাড়ে কমে। ঘোরে পড়লে দাড়ি রাখে। ঘোরে না থাকলে চাচাছোলা হয়ে যায়। একমাথা বাবড়ি চুল ছাড়া তার বইবার মতো বোঝাও নেই।

সুখোর কাছে গেলে হয়।

ধান্দা।

সুখো মাঝে মাঝে খদ্দের জুটিয়ে দেয়। যদি কোনও খবর থাকে। তবে ওই হলগে কাল। পয়সা হাতে এলে মাথা ঠিক রাখতে পারে না। সুখো নিজেই আসর বসিয়ে উপার্জনের পয়সা খসিয়ে ছাড়ে। ফুল্লরাকে জানতেও দেয় না, গ্রহদোষ খণ্ডন করে তার উপার্জনের ত্রিশটা টাকা, গাঁজা ভাঙে শেষ করে ন্যাংটো ফকির? ফকির হয়ে সে ফিরেছে।

তবে তার একখানা কথা। পথে নারী বিবর্জিতা—এমন এক অমৃতভাষণে কী না জানি সত্যি লুকিয়ে আছে—ফুল্লরার পেটের দানোটাকে সে স্বীকার করবে না। তার নামে মাত্র একখানা রুটি বরাদ্দ করে যাওয়া! কোথায় যাবি দেখব! কে তোরে পালন করে দেখব! সিঁথির সিঁদুরে কত তর তেজ দেখব। রাতেই শুনিয়ে রেখেছে—শরীর বশে কথা। হাত দিলে ঝটকা মেরে ফেলে দিয়েছিল ফুলি।

ঘুমাতে দাও।

তোর ঘুমের খেতা পুড়ি। হাত দিলে গরম হয় না শরীর! পেটে ওটা হয় কী করে তবে!

কী করে হয় জান না?

কবে জানতে দিলি!

মুখ খসে পড়বে বলছি।

মুখ আমার খসে পড়বে, না তোর! আমি সাধুমানুষ। মিছে কথা বললে পাপ হয় জানিস! পাপ বাপকেও ছাড়ে না। শাস্ত্রে লেখা আছে, জানিস!

আমার পাপ নাই। হাত সরাও।

পাপ তর পেটে। বাড়ির বার হলে তর তাওয়া গরম। ঘরে ঢুকলে ঠাণ্ডা।

এটা আমার পাপ না তোমার পাপ। মুখে পোকা পড়বে বলছি।

পেটে ধরবি তুই, পাপ হবে আমার! পোকা পড়বে আমার।

ছাড় ছাড় বলছি। হাত দিয়ে দ্যাখ!

তুই তুকারি শেষে! ফুল্লরা চেঁচামেচি শুরু করে দেয়।

তাকে ঠেলে ঠুলে ফেলে দিয়ে কাপড় সামলাতে গিয়ে বলল কিনা, শুয়োরের বাচ্চা! স্বামীকে শুয়োরের বাচ্চা বলা কি উচিত! দু দণ্ড ভার নিতে পারলি না। সাধুর আগুন জঠরে নিতে পারলি না, তুই আবার আদ্যাশক্তির অংশ বলে সাধুর কাছে মোহ সৃষ্টি করিস!

জোরজার করে মাচানে ফেলে দিয়ে ঠ্যাং তুলে দিতেই ছিন্নমস্তা।

ফুলি তড়পে নীচে নেমে গেল। তারপর মাচানের তলা থেকে দা খানা টেনে দেখাল।

গায়ে হাতে দিলেই ওটা কেটে ফেলব।

নারান চুপসে গেল। সব কিছু নেতিয়ে গেল। হাতে দা। ছিন্নমস্তা তিনি। আদ্যাশক্তির আর এক প্রকাশ।

গেনু গোলা নীচে চটের মধ্যে শুয়ে অঘোরে ঘুমাচ্ছে। কুপি জ্বালা ছিল। শুয়ে ফুঁ দিয়ে নেভাবে ফুল্লরা, আর তখনই পাছায় হাত।

তিড়িক করে লাফ দিয়ে পাছা সরিয়ে নিতেই সে বলেছিল, তর ক' মাস ?

কী করে বুঝব ?

হিসাব নাই।

না।

পাছায় হাত দিয়ে যে সুযোগ নষ্ট করেছে সে বোঝে। তারপর মাসের হিসাব জানতে গেলে আরও খাপ্পা।

সেও ছাড়বে কেন ?

হিসাব আছে ফুলি। গণ্ডগোল পাকাস না। আমার হাজতবাসের সময় গর্ভে তর সন্তান আসে কী করে ?

কী বললে ! ঘরের এককোণে দাঁড়িয়ে সাপের মতো ফুঁসছিল।

লোকে বলছে।

কোন শালার বাচ্চা বলছে। ডাক দিকিনি।

আই। রাগ করছিস কেন। ঠিক আছে আমি স্বীকার করছি, ওটা আমারই। দুটো টাকা ছাড়।

টাকা নেই।

শ্যামাকে বলে দে।

ও দেবে না।

টাকা না দিলে কথা উড়বে। তখন বলবি না আমি কথা উড়িয়ে বেড়াচ্ছি।

ফুল্লরা বড় অসহায় বোধ করছিল। চোখে জল। হাতের দাখানা এগিয়ে দিয়ে বলেছিল, তার চেয়ে গলাখানা পেঁচিয়ে দাও।

হারামজাদি মাগি ভারী জব্দ। তারপর সে যা বলেছে তাই করেছে।

কাত হয়ে শো।

ফুল্লরা কাত হয়ে শুল।

পাছা এগিয়ে দে।

তাও দিয়েছিল।

ভোগ। তারপর শুধু ভোগ। শরীরের গরম নষ্ট। সে হালকা হয়ে মাদুর বগলে কাঁথা গায়ে বারান্দায়। তারপর ঘুম। ঘুম ভেঙে গেলে সকাল। দরজা খোলা। ভোররাতেই লাইনে বের হয়ে গেছে। রুটি মাত্র একখানা বরাদ্দ। খেপে লাল।

ক্ষুধায় পেট জ্বলছে। জ্বলুক। তার অভ্যাস হয়ে গেছে। সে মানুষজনের সঙ্গে মাথা খারাপ করে না। তার মাথা খারাপ হয় কেবল ফুল্লরার কথা ভাবলে। শীতের চাদরও তার নেই। ফুটাফাটা আর একখানা খুঁট গায়। তার একজনই শুধু শত্রুপক্ষ। দিনমান তাকে ঘুরে বেড়াতে হয়। মোড়ের দোকানে গিয়ে কখনও বসে। দেশের বাবুমানুষেরা সব যে চোরচোট্টা হয়ে গেছে এই নিয়ে কথা বলে। কেউ কান দেয় না। মাথা খারাপ লোক ভাবে। যে যার মতো চা খেয়ে উঠে যায়। এক কাপ চা খাইয়ে দয়াটুকু পর্যন্ত দেখায় না।

কোথায় যে যায়।

হাঁটতে হাঁটতে বড় সড়কের গাছতলায়। তার কেমন ঝিমুনি ধরে শরীরে। খুঁটখানা

পেতে শুয়ে পড়ে।

ঘুমের মধ্যে নারান বড় একটা আমবাগান দেখতে পায়। আমবাগানে সুখো ঝোপজঙ্গল সাফ করছে যেন।

কে ?

আমি নারান সাধু। কোনও খবর আছে ?

যে বোঝে সে বোঝে। কোদালের বাঁটে ভর দিয়ে সুখো বলল, বৌদি ঘরে নাই বুঝি !

সে কথা থাক। সাধুমানুষের ঘর বার সমান। সাধুমানুষের পরিবার সংসর্গে পাপ। কোনও খবর আছে কি না বল।

খবর তো আছে সাধু, তবে বলতে সাহস হয় না।

বলে ফ্যাল। দুনিয়ায় কেউ ভাল নেই। সব শালা খানকির ব্যাটা। দ্যাখ না জব্দ করি কী করে।

সুখো এদিক ওদিক তাকিয়ে ফিসফিস গলায় বলল, কর্তার কুমারী কন্যে গর্ভবতী।

নারান তড়াক করে লাফিয়ে উঠল। সুখোর কাছে যেতে হয়। স্বপ্ন মিথ্যা হবার নয়। সময়-কাল, পক্ষ হিসাব করে বুঝল, কিছু একটা হয়েছে। সুখোর সঙ্গে দেখা হলেই বলত, কর্তার বড় বিপদ। বিপদটা কী বলত না। পাটের আড়ত, কুমারী কন্যে, কলেজে যায়—ধন্দ আগেই ছিল, স্বপ্নটা তাকে যুস জুগিয়ে দিল।

সোজা আমবাগানে। হ্যাঁরে সুখো আছিস।

আরে সাধু দেখছি ! হঠাৎ। কী মনে করে।

তোর কর্তার শিয়রে সমন জানিস।

সাধু তুমি জান !

না জানলে আসি ! সময় কোথায়। শোন দশ কান করা ভাল না। গোপনে যদি সেরে ফেলা যায় !

সাধু আমাকে রক্ষা করো ! পায়ে পড়ছি। কেউ জানে না। কর্তা আর তার পরিবার জানে। কচুকাটা করে ছাড়বে। যদি পার গোলাম হয়ে থাকব। রানিদির মুখ থেকে রা খসাতে পারছে না। কখন না গলায় দড়ি দেয় সাধু।

সব ঠিক হয়ে যাবে। আগে কিছু খাওয়া।

কী খাবে ? ডাব পেড়ে দেব। মুড়ি মুড়কি আনিয়ে দেব। খাও সাধু। তুমি গুপ্তবিদ্যার অধিকারী। আমি জানতাম তুমি আসবে।

জলে ভিজিয়ে মুড়ি মুড়কি, ডাবের শাঁস এবং জলে পেট ভর্তি সাধুর। উদগার ওঠে তার।

এই হলগে সমসার। বুঝলে সুখো। সব ঘরে আগুন। একশ টাকা লাগবে।

একশ টাকা !

একশ টাকায় জান লেব, কত শস্তা বল !

সে অবশ্য হক কথা। সুখো বলে, পাত হবে তো !

আদ্যাশক্তির দাস আমি। পাত হবে না মানে ! বিশ্বসংসার ওলট-পালট হয়ে যাবে তবে। দশ কান হল না, তোর মুণ্ডু কাটা গেল না, অথচ কন্যে গঙ্গাজলে নেয়ে উঠল।

সে দেব। তুমি ব্যবস্থা করো।

নারান বলল, আমি বামুনের বেটা। কাজ করি চামারের। জানিস বামুনের মুখে আগুন থাকে।

তা জানি না। মুখে আগুন না থাকলে ওষুধে কাজ দেবে কেন ? আমরা দিলে তো হয় না !

সেই। নারান তারপর দাঁত খোঁচাতে থাকল কাঠি দিয়ে।

দ্যা একখান বিড়ি। আর শোন, আদ্যাশক্তির মহাজন ব্যোম মহাদেব—গাঁজা ভাঙ প্রভৃতির জন্য আলাদা পয়সা লাগে। তার সেবা লাগে।

কত ?

সোয়া পাঁচ টাকা।

দেখি জোগাড় করতে পারি কি না। আমি তো সাধু বড় গরিব মানুষ।

ভেতরে সাধুর প্রভু প্রভু ভাব এসে গেছে। দুলছে। আর দণ্ডটি দিয়ে ঘাসে বাড়ি মারছে। ঘোর উদয় হয়ে গেছে। সুখো চুপচাপ বসে থাকে। যোগী মানুষ। অন্তরাত্মা কাঁপে।

নারান এখন আর যেন সুখোর মিতা নয়। পুরো প্রভু প্রভু ভাব। চোখ তার দোদুল্যমান। ঘোরের মধ্যেই বলল, তুই পাবি প্রেসাদ ব্যাটা। তোর ঝুপড়িতে মচ্ছব। রাতে লাগাবি।

নারানের মধ্যে প্রভু প্রভু ভাব আরও চাগিয়ে উঠছে। সুখো যে তার মিতা দোস্ত সে সব একেবারেই মনে নেই। স্বপ্নাদ্য ওষুধ, নিমতলায় থান, সুখোর মতো সাকরেদ, থানের পাশে ত্রিশূল, বাঘের ছালে উপবেশন, করোটি সিঁদুর মাখা—যুবতী নারীরা আসছে বাবাকে দেখতে, জয় সাধুবাবা—তার ঘোর বাড়ছে। নারান দুলতে থাকল। হাতে গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, কপালে সিঁদুর। আসছে গোকুল দাস, নরেন চাকি—এরা সব মানিজন। বাবার কৃপাপ্রার্থী সবাই। দারোগাবাবু হাজির। গোঁফ কামিয়ে এসেছে—আমি বাবা ভুল করেছি। আপনার মাহাত্ম্য এত জানতাম না। প্রভু ক্ষমা করুন অধমকে। আসছে পঞ্চুবাবু—আমার যে কী মতিভ্রম হয়ে গেল বাবা। ঝাণ্ডা হাতে আপনারে মিছিলে নামিয়েছি—নাকে খত, আর হবে না। আমার বড় আকাঙ্ক্ষা জেলার প্রধান হব। বর দিন অভয় দিন, দান ধ্যান কী করতে হবে বলে দিন, সব করে দিচ্ছি।

সে হেঁকে উঠল, পাঁঠা চাই। মার কাছে পাঁঠা। পাঁঠা পাঁঠা !

একখানা পাঁঠা এসে গেল।

স্নান করে আয়। তিল তুলসী নিয়ে বসে যা।

এই বাবা বসলাম।

এবার নিজের মনের বাসনা মনে মনে বল।

সে ত্রিশূল তুলে প্রধানের মাথায় ছুঁইয়ে দিয়ে বলে, যা।

পঞ্চুবাবু চলে যাচ্ছিল।

এই শোন।

করুণা করেন প্রভু।

উলঙ্গ হয়ে যা।

বাবা !

উলঙ্গ হয়ে যা ব্যাটা। সবাইকে উলঙ্গ করে ছাড়ছিস, নিজে একবার উলঙ্গ হয়ে বুঝবি না কেমন লাগে।

বাবার আদেশ। পঞ্চুবাবু উলঙ্গ হয়ে গেল।

এবারে নাচ। ঢাকি যেমন ঢাক বাজায়, তেমনি ঢাক বাজিয়ে নাচ। সবাই তোর নাচ

দেখতে চায়। নাচ। ঢাক বাজা। পঙ্কা নাচছে।

'সাধুর পূর্বজীবন— দুই 'পড়ে কিরণ সটান শুয়ে পড়ল বালিশে। ছোড়দি ইজিচেয়ারে শুয়ে চোখ বুজে শুনছিল। শেষ হতেই তাকাল সীতেশের দিকে। তারপর পাশে। কাঞ্চন মাথা নিচু করে বসে আছে। একবার ছোড়দির মুখ দেখতে গিয়ে চোখে চোখ পড়ে গেল। গোটা লেখাটা এত বিশ্রী শোনাল, কাঞ্চন বিশ্বাস করতে পারছে না। তবে হেরম্ব সাধুর পূর্বজীবনের খবরাখবর প্রায় এই রকমেরই। অবশ্য সবই শোনা কথা তার। ছোড়দি তার সম্পর্কে কী না ভাবল !

কিরণ হাই তুলে বলল, মন্দ এগোচ্ছে না। ঠিকই ডেপিকট করেছিস। আমাদের সাধু বাবাজীবনদের পূর্ববৃত্তান্ত এরকমেরই। তবে লেখাটা তোর মেজাজের সঙ্গে একেবারেই খাপ খায়নি। বুঝি লেখকসত্তা আর ব্যক্তিসত্তা কখনও এক হয় না।

সীতেশ বলল, তোর রুচিবোধের প্রশংসা করতে পারছি না কাঞ্চন। তুই এত সুন্দর কবিতা লিখিস, লেখায় বিন্দুমাত্র তার আভাস নেই।

ছোড়দি কিছু বলছে না।

কিরণদাই সাপোর্ট করল তাকে।

কবিতার আভাস গল্প উপন্যাসে না থাকলে ক্ষতি নেই। আসলে চরিত্রগুলির মধ্যে সংঘাত যত তীব্র হবে, ততই গল্প উপন্যাস সার্থক হতে পারে। ওর লেখায় তা ফুটে উঠেছে। কুসংস্কার মানুষকে কতটা দুর্বল করে দেয়, আর দেবদেবীর নামে মানুষ কত অমানুষ হয়ে উঠতে পারে উপন্যাসে কাঞ্চন তা ধরার চেষ্টা করছে। তবে সার্থক উপন্যাস কিন্তু এ-সবের ঊর্ধ্বে। মানুষ বিচিত্রগামী। আত্মরক্ষার্থেই সে তার ক্ষমতাকে ব্যবহার করে থাকে। সবারই যে চাই গুপ্তধন। কোদাল কার হাতে নেই—সাধুকেও দোষ দেওয়া যায় না, অসাধুকেও না।

ছোড়দি এখনও কোনও কমেন্ট করছে না।

কাঞ্চন ছোড়দির কমেন্ট প্রত্যাশা করছে। কিন্তু কেমন তার অপরাধী মুখ। ছোড়দি তার সঙ্গে সেদিন না শুলেই পারত। এই ভুলটা ছোড়দি কেন যে করতে গেল ! না হলে সে বোধহয় চরিত্র চিত্রণে আরও সংযম রক্ষা করতে পারত।

এমনকি ছোড়দি তার দিকে আর তাকাচ্ছেও না।

সীতেশদা লেখাটা নিয়ে উল্টেপাল্টে দেখে পাশে ফেলে রাখল। ছোড়দির সে আগ্রহও নেই। যেন লেখাটা ধরলে জাত যাবে।

কিরণদা তোমার চা-এর কী হল ?

বাণী চা দিয়ে গেছে পড়া শুরু করার আগে। পড়া শেষ হলে আবার চা আসবে কথা আছে। কিরণদা চা-এর কথা ভুলে যেতে পারে। ছোড়দি মনে করিয়ে দিয়ে কী বোঝাতে চাইল কে জানে ! বাণী আজ শাড়ি পরেছে। বাণীকে মনেই হয় না বালিকা। ছোড়দি কি টের পেয়ে গেছে আসলে সে নষ্ট চরিত্রের। অন্ধকার তার বেশি প্রিয়। অন্ধকারে সে সব করতে পারে। 'মনের অন্ধকার গাঢ় হলে, তোয়ালে স্নিগ্ধময়—সুঘ্রাণের সুবাস মাতাল করে, আচ্ছন্ন করে, স্পর্শ কখনও কবিতা হয়, মদির হয় শারীরিক ব্যবহার। স্নানঘরে কোনও অনাবৃত নারী হয়ে ওঠে মধ্য যামিনী।'

বাণী শাড়ি পরে আজ খুব ভুল করেছে। বাণী সম্পর্কে নানা অনুষঙ্গ তার কোমল হৃদয় ব্যথিত হয়। ছোড়দি তুমি একবার ছুঁয়ে দাও লেখাটা। একবার হাতে তুলে নাও। আমার তো এখন খিদে পায়। তুমি যে-ভাবে গড়ে তুলছ, তার চেয়ে বেশি কিছু আমি

নই। সাহসী করে তুলছ। কলকাতার এত বড় কাগজে কবিতাটা তোমরা পাঠালে, আর সঙ্গে সঙ্গে ছাপা হয়ে গেল। চিঠি আসছে কত। যত চিঠি আসছে তত তুমি অহঙ্কারে ডুবে যাচ্ছ। একগুচ্ছ কবিতা রেখেছ কাছে। কলকাতায় গেলে জায়গা মতো দিয়ে আসবে। সেই তুমি এত চুপ করে গেলে কেন।

কাঞ্চনের সাহসও নেই বলে, ছোড়দি লেখাটা ঠিক এগোচ্ছে তো। ছোড়দি যতটুকু দেয়, সে তা গ্রহণ করে মাত্র। ছোড়দি যতটা সাহস দেয় সে ততটা সাহসী হয় মাত্র। তার চেয়ে বেশি নেবার ক্ষমতা নেই, অধিকারও নেই। বাণী শাড়ি পরায় তুমি খুব খুশি না!

বাণী চা-এর ট্রে হাতে নিয়ে ঘরে ঢুকতেই কাঞ্চন সরে বসল। সরে না বসলে আঁচল উড়ে পড়তে পারত গায়ে। নতুন শাড়ি পরলে এলোমেলো হয়ে যেতেই পারে। ছোড়দির চোখ এড়াবে না—ঠিক লক্ষ করবে। সে কেন যে বলতে গেল, বাণীর ফোরের জীবন চার বছর বাদে যে এক নেই বুঝতে না পারলে তারও দিদিদের মতো সন্ন্যাসিনী হবার ভয় থাকে। এক নেই টের পেয়েই না খেয়ে পালিয়েছিলাম। আবার না নন্দিনী হয়ে যায় বাণী। আতঙ্কে পালিয়েছি। দুরারোগ্য ব্যধি মানুষের—তুমি আমার আরোগ্যলাভের উপায়। আমার পাশে চুপচাপ শুয়ে না থাকলে বুঝতে পারতাম না।

ছোড়দি চা মুখে দিয়েই বলল, দারুণ। কে করেছে। বশিষ্ঠদা।

না, আমি করেছি।

মাসিমা কাছে ছিল ঠিক।

না না।

এই না না করার মধ্যে এত আর্তি কেন। ছোড়দির কি এখনও অবিশ্বাস আছে, বাণী পারে না! পারবে না। তাকে দমিয়ে দিচ্ছে কেন। বাণী তার দিকেও তাকাল। সেও। তারপর কী মনে হল কে জানে, কাঞ্চন উঠে এগিয়ে গেল।

লেখাটা হাতে নিয়ে বসে থাকল।

কিরণদা বলল, পরের কিস্তি কবে ?

সীতেশদা বলল, আমার কিন্তু সময় হবে না।

কাঞ্চন লেখাটা তুলে ছিঁড়ে ফেলতে যাচ্ছিল—আর তখনই ছোড়দি বলল, আমার সময় হবে। তবে তাড়াহুড়োর দরকার নেই। প্রতিযোগিতা, পুরস্কার বাজে ব্যাপার। পুরস্কারের আশা করে লিখলে লেখাটা মার খেতে পারে। নিজের থেকে উঠে আসুক। যতদিনে পারিস, দু পাঁচ মাস বছর, সময় কোনও ফ্যাক্টর নয়। বিষয়টা ঠিকই ধরেছিস। বিশ ত্রিশ পাতা পড়ে লেখা সম্পর্কে কোনও কমেন্ট করা ঠিক না।

কাঞ্চনের মনে হল, ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল।

সীতেশদা কেন যে ছোড়দির দিকে অপলক তাকিয়ে আছে—কিছু বলতে পারে, বাড়ি গেলে ফাটাফাটি হতে পারে, তবে ছোড়দি জানে কাকে কীভাবে সামলাতে হয়। সংশয় এমন এক ফুৎকারে উড়িয়ে দিতে জানে ছোড়দি, সে দেখবে একদিন সীতেশদাই আবার তার খোঁজে হন্যে হয়ে ঘুরছে।

তোকে নাকি ছোড়দির খুব দরকার। কালই যাবি। মনে থাকবে তো।

ছোড়দি কেন যে শেষে বলল, প্রতিযোগিতা নিজের সঙ্গে। তাকে বলল, অথচ চেয়ে আছে বাণীর দিকে। উপন্যাসটা লিখছিস, লিখে যা। পুরস্কারের কথা ভেবে নয়, প্রতিযোগিতার কথা ভেবে নয়। নিজের কথা ভেবে নয়, জীবনের হার-জিতের কথা

ভেবেও নয়, যদি আনন্দ পাস লিখবি।

সীতেশদা খেপে গেল।

তোমরা কেউ কিন্তু লেখাটা যে অশ্লীল তার কথা বললে না। শুরুতেই এই—জানি না শেষে কী হবে!

কিরণদা লাফিয়ে উঠে বসল। সীতেশদার কোনও প্রবল জবাব দেবে বোধহয়—তা না, সোজা ছুটে দরজা দিয়ে বাইরে বের হয়ে গেল। গাছটার নীচে বশিষ্ঠদা লাঠি ভর করে দাঁড়িয়ে আছে। জঙ্গলের ভেতর ঢুকে বাড়িটাকে দেখছে। সেও দু একবার এমন দেখেছিল। সারাজীবন বাড়িটায় কাটিয়ে শেষ বয়সে দূর থেকে নিজের জায়গা এভাবে কেউ দেখে!

ভীষণ চোটপাট করছে কিরণদা।

আবার বের হয়েছ! কী দেখছ! তুমি কি আমাদেরও বাড়ি ছাড়া করে ছাড়বে ভাবছ। যাও, ভিতরে যাও।

যাবে না।

বশিষ্ঠদা রোগে ভুগে এখন বুড়োমানুষ। ক্ষোভ অভিমান থেকে বাড়ির বার হতেই পারে। এই বাড়ি ছাড়া সে আর কোনও জায়গা চেনে না। সারাদিন ঘরে শুয়ে থাকতেও পারে না। মাইলড অ্যাটাকে স্মৃতিশক্তিও ঠিক নেই। লাঠি ভর দিয়ে হাঁটে। বোধহয় বেশি দূরও যেতে পারে না। ভয় হয় হারিয়ে না যায়। আবার ঢোকার মুখে বুঝি মনে করে—এ-বাড়িটা থেকে সে কি বের হয়েছে! ভুলভাল করে ফেলেনি তো। অন্য কারোর বাড়িতে ঢুকে যায়নি তো! তারপর কী মনে হয়? এই বাড়ি। হ্যাঁ এই বাড়িতে সে শশীর হাত ধরে ঢুকেছিল। শশী উকিল তাকে শীমুলতলায় পায়। এর চেয়ে বোধহয় সে বেশি কিছু জানেও না। রাজপুত। বশিষ্ঠ সিং। এতটুকু মনে করার পরই সে তার জায়গায় ঠিকই আছে বুঝতে পারে।

বশিষ্ঠদাকে হাত ধরে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। যাবে না।

কিরণদার চিৎকার, আরে তুমি ওভাবে দাঁড়িয়ে থাকলে মা ভয় পায় বোঝো না। এসো বলছি। দেখার কিছু নেই। যা দেখার দেখে ফেলেছ। ঘাটের মরা—আর কী দেখতে চাও। আর কত দেখবে!

কিরণদার সঙ্গে ধ্বস্তাধ্বস্তি। কিছুতেই যাবে না। লাঠিতে ভর করে বাড়ি দেখবে। এমনকি তার তখন পলকও পড়ে না বোধহয়। গ্রীষ্মের শেষ বিকেলে কেমন বেমানান। ছোড়দি উঠে দাঁড়াল। করছে কী! মেরে ফেলবে নাকি। পাঁজাকোলে তুলে সিঁড়ির দিকে যাচ্ছে।

ছোড়দি দৌড়ে গিয়ে বলল, কী পাগলের মতো কাণ্ড করছ কিরণদা। ছেড়ে দাও। বুড়োমানুষ, মাথা ঠিক নেই, শেষে না কী করে বসে!

কিরণদা ছেড়ে দিল ঠিক, তবে দমল না।

যাও। ঘরে ঢুকে যাও। বাড়াবাড়ি করলে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখব।

তারপর কিরণদা ঘরে ঢুকলেন। বেশ হাঁপাচ্ছেন। বসলেন চকিতে। দু'হাতে ভর দিয়ে মাথা নিচু করে রাখলেন। কাঞ্চন যেন একিরণদাকে কখনও দেখেনি। চোখ দুটো লাল। বিরক্ত। বোধহয় এখন মানে মানে সরে পড়া দরকার। কিছুটা মতিচ্ছন্ন অবস্থা। কেমন খেপে গিয়ে সীতেশকে বলল, শ্লীল অশ্লীল বলে কিছু নেই। এ লোকটার হাতে আগুন আছে জানিস।

আগুন!

হ্যাঁ আগুন। ইচ্ছে করলে সব জ্বালিয়ে দিতে পারে। দিয়েছেও। এখন নিজে পুড়ছে। আতঙ্কে বোন দুটো আমার সরে পড়ল।

কার কথা বলছ!

আর কার কথা! ফাটাফাটি। শেষ হয়েও বাড়িটার মোহে পুড়ছে। নিশ্চয় বুঝছিস এর মধ্যে কোনও নারীর কথা আছে। যার জন্য পারছি না। পারলে খুন করতাম।

কাকে?

নিজেকে। বাণীর কথা ভেবে পারছি না। বাণীকে রক্ষা করতেই হবে।

কিরণদার কথাবার্তা কিছুটা অপ্রকৃতিস্থ। কিছুটা অসংলগ্ন। বাণী আসে কোথা থেকে। লোকটা কি এ-বাড়ির সর্বনাশের মূলে—কোনও ব্যভিচার—মাসিমাকে তো কিরণদা বেশ ভক্তি-শ্রদ্ধা করে। আভিজাত্যের ছলনা থেকে কি! ধরা পড়ে গেলে মুখ দেখাবে কী করে! কিরণদার ভাই-বোনগুলোর মুখের সঙ্গে বশিষ্ঠদার আশ্চর্য মিল। একমাত্র কিরণদাই বাপের মুখ চোখ রঙ পেয়েছে।

কাঞ্চন বলল, আমি কি উঠব কিরণদা!

উঠে যাবি কোথায়! বাড়ি! সাইকেলে যাবি। কতক্ষণ আর লাগবে। আর একটু বোস না।

ছোড়দি বলল, ঘরে না বসে রাস্তায় বের হলে হত না! চল না আমার খোলা ছাদটায় গিয়ে বসি। ঝিলের ঠাণ্ডা হাওয়া। বসে থাকলে মন জুড়িয়ে যায়। তোমারও ভাল লাগবে।

তা হলে তোমরা যাও। এখন বের হতে পারছি না। একটু অসুবিধা আছে।

॥ ৮ ॥

রাস্তায় নেমে সীতেশ ইচ্ছে করেই যেন পিছিয়ে পড়ল। ছোড়দি আর কাঞ্চন এগিয়ে যাচ্ছে। ওরা হাসপাতালের মাঠ পার হয়ে রেল কলোনির রাস্তা ধরে হাঁটছে। কাঞ্চনই যেন মনে করতে পেরে এদিক ওদিক তাকাল—সীতেশদা কোথায়! আরও তো একজন ছিল সে নেই কেন!

কাঞ্চন দাঁড়িয়ে পড়লে ছোড়দিও আর হাঁটল না। ইদানীং একটা ঝোলানো কাপড়ের লম্বা সাইডব্যাগ সঙ্গে রাখে কাঞ্চন। ঝোলার মধ্যে প্রিয় কবির কবিতার বই, কিংবা কিছু লিটল ম্যাগ, বড় একটা ডাইরিও থাকে। কোথাও দু লাইন দশ লাইন কবিতা লেখা। কবিতা সহজে তার সম্পূর্ণও হয় না। সঠিক শব্দমালার খোঁজে পাগলের মতো উচাটনে পড়ে যায়। মাইলের পর মাইল হাঁটে। কবিতা ছাড়া ছেলেটা কিছুই বোঝে না। জোরজার করে কেন যে ছোড়দি আর কিরণদা উপন্যাস লেখাবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে—আর যা আজ পড়ে শোনাল—তাতে মনে হয়েছে, কাঞ্চন কবিতা ছাড়াও অনেক কিছু জেনে গেছে। বিশেষ করে ছোড়দির সামনে, তার এই অশ্লীল লেখাটা পড়ে কি না শোনালেই হত না! যতটা সরল সোজা এবং কবিপ্রকৃতির মনে হত, লেখাটা পড়ার পর কাঞ্চন সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা আমূল বদলে গেল। ছোড়দি কি তাকে কিলিয়ে কাঁঠাল পাকাচ্ছে। কে জানে। মাতাল অবস্থায় তাকে ঘরে রেখে পাশের ঘরের দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়ার স্বভাব আজকের নয়। অনেকদিনের। কাঞ্চন তো তার পরের ঘরটাতেই

ছিল। তবে ছোড়দির রুচিবোধ, কাঞ্চনের রুচিবোধকে সে এতদিন শ্রদ্ধা করত। লেখার দ্বিতীয় কিস্তি তার না শুনলেই ভাল লাগত। মনে হয় ছোড়দিরও।

পাছে কষ্ট পায় এই ভেবেই হয়তো বলল, বিশ ত্রিশ পাতায় কোনও উপন্যাস সম্পর্কে কমেন্ট করা চলে না। এটুকু আশার কথা না শোনালে ছোঁড়া যা খেপে গিয়েছিল, তাতে দ্বিতীয় কিস্তিটি ছিঁড়ে ফেলা অসম্ভব ছিল না। ছোড়দি কাজটি একপক্ষে ভালই করেছে। দুটি গল্প লিখেছে, বড় তুচ্ছ বিষয়, অথচ অসামান্য শেষ। তুচ্ছ ঘটনা নিয়ে এমন সুন্দর গল্প লেখা যেতে পারে আগে কখনও তার মনে হয়নি। কিন্তু এবারের বিষয়টি আদৌ তুচ্ছ নয়, কুসংস্কার এবং মানুষের ধান্দা একজন গরিবমানুষকে, কতটা অমানুষ করে তুলতে পারে, উপন্যাস রচনার হেতু এটাই তার মনে হয়েছে। এরকম চরিত্র হয়, বিশ্বাস করতেও পারছে না। অথচ গল্পের বাঁধুনি এবং চরিত্র নির্মাণে দক্ষতার ছাপ আছে। অবিশ্বাসও করা যায় না।

সীতেশ কাছে এগিয়ে গেল।

তুই কি সোজা বাড়ি যাবি। না তোর ছোড়দির বাড়ি হয়ে যাবি!

বাড়ি চলে যাব। এত পেছনে পড়ে গেলে কেন!

কাঞ্চনের সাইকেলটি সঙ্গে সঙ্গেই থাকে। ছোড়দি কি হাঁটছে বলে পাশে সে সাইকেল নিয়ে হাঁটছে। ইচ্ছে করলে ছোড়দিরা রিকশায় উঠে চলে যেতে পারত, কিন্তু ছোড়দির ইচ্ছে হেঁটেই যাবে। যেন রিকশায় উঠে পড়লে, বেশি তাড়াতাড়ি কাঞ্চনের সাহচর্য মিস করবে। এইজন্যই রিকসায় উঠছে না।

তোরা তবে যা। ক্লাব হয়ে আমি যাচ্ছি। মিঠুকে পৌঁছে দিয়ে যাস।

কেন আমি কি রাস্তা চিনি না!

চিনবে না কেন। যাও না।

ক্লাবে কিন্তু জমে যেয়ো না। একা একদম ভাল লাগে না।

সীতেশের ঠোঁটে আশ্চর্য হাসির ঝলক। মিঠুর স্বভাব সে বুঝতে পারে না। কখনও এত আদরে কাছে টেনে নেয় এবং সর্বস্ব উজাড় করে এমন উপভোগ করতে দেয় যে মনে হয়, ইহজীবনে সীতেশই একমাত্র পালের দড়িটি হাতে ধরে বসে থাকতে পারে। হাওয়া বুঝে পালের দড়িদড়া আলগা করতে জানে। আবার কখনও এত কোল্ড, যেন হিমঘরে বসে আছে মিঠু। কুয়াশা জমে আছে ঘিরে। তারপর বরফ হয়ে যাচ্ছে। মোমের পুতুলের মতো মনে হয় কখনও। একটুতেই লাগে বলে চিৎকার করে ওঠে।

মাতাল অবস্থায়ও মিঠু যদি চায়, তাকে নাস্তানাবুদ করে ছাড়তে পারে। করে না যে তাও না। মাঝে মাঝে শীতের কুয়াশা কেন তাকে এত কাবু করে ফেলে সে বোঝে না। আত্মরক্ষার্থে, পাশের ঘরে ঢুকে দরজাও বন্ধ করে দেয়। বাড়িতে কাজের লোক থাকে, হৈচৈ করতে পারে না। দরজায় ধাক্কা দিতে পারে না। রাখহরি গামছা কাঁধে ফেলে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসবে উপরে। বাড়িটার দোষ গুণ যাই বলা যাক না, সামান্য শব্দই এত ভয়ঙ্কর হয়ে দেয়ালে দেয়ালে মাথা কুটে মরে যে, সে নিজেই তখন অপ্রস্তুত হয়ে যায়।

রাখহরি ভ্যাবলাকান্ত মুখ নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। মিঠু কি ওকে রেখেছে, সীতেশ বাড়াবাড়ি না করতে পারে এই ভেবে। নাটক করতে কার ভাল লাগে! কাজের লোক এতে বেশি মজা পায়। সে রাখহরিকে হটাতেও পারে না। সিঁড়ির মুখের দরজাটি খোলা রাখা হয়। সে আতঙ্কে সহজেই উপরে উঠে আসতে পারে। বাড়াবাড়ি না করে সীতেশ

দরজা থেকেই ফিরে যায়। কখনও একা খোলা ছাদে বের হয়ে যায়। চেয়ারে বসে থাকে, উত্তেজনা কমলে ঘরে ঢুকে শুয়ে পড়ে।

দরজা তখনও বন্ধই ছিল।

আসলে তাকে নিয়ে খেলতে ভালবাসে। তার ইচ্ছে-অনিচ্ছের দাম নেই। জীবজন্তুর মতো আচরণ। পেলেই উঠে পড়া। সুশ্রী এভাবে উপগত হতে একদম পছন্দ করে না।

সীতেশ দেখল, দিঘির ধারে রবীন্দ্রভবনের আড়ালে তারা হারিয়ে গেল।

কাঞ্চন বলল, আমি আসি ছোড়দি।

তোকে যে বলল, বাড়ি পৌঁছে দিতে। বাড়ি পৌঁছে না দিলে তোর সীতেশদা রাগ করতে পারে। তোর এত কাজ করে দেয়, আর তার বউকে এগিয়ে দিতে পর্যন্ত পারিস না। আত্মপর।

তা করে। সে কবিতা লিখে ছোড়দিকে দিয়ে দেয়। ছোড়দি, সীতেশদার সুনাম আছে কলকাতার কাগজে। তাদের কবিতার সঙ্গে তার একটা বাড়তি থাকল। অথবা ছোড়দিই বলবে, তার কবিতা শেষ পর্যন্ত পাওয়া যাবে কি না বলা মুশকিল। ছোড়দি কিংবা সীতেশদা ছাড়া তার কাছ থেকে কেউ কিছু লিখিয়েও নিতে পারে না। দু'জনেই প্রায় তার ইজারা নিয়ে বসে আছে। মাঝে মাঝে মনিঅর্ডার আসে—একটি কবিতায় তো সে নামী কাগজ থেকে একবার একশ টাকা পেয়েছিল। যে কটা না শব্দ তার চেয়ে বেশি টাকা।

খাওয়া।

খাও।

তোর টাকায় খাওয়া যায় না।

কেন, কেন ছোড়দি।

যে নিজে খেতে জানে না, তার সঙ্গে খেয়ে সুখ নেই।

ছোড়দি রেস্তোরাঁয় নিজে বিল মিটিয়ে মৌরি আলগা করে মুখে ফেলে বলেছিল খাওয়াটা পাওনা থাকল। খুশিমতো খাব।

কবে খাবে বল!

বললাম তো খুশিমতো খাব।

খুশি মতো কি কিছু খাওয়া যায়, খুশি মতো খাবে বলে আমার টাকা খরচ করতে দিচ্ছ না।

বোকার মতো কথা বলিস না। আচ্ছা কুকুরের বকলসের মতো তোর সাইকেলটা সঙ্গে না থাকলে চলে না।

বাসে ভিড়। উঠতে পারি না। দম বন্ধ হয়ে আসে।

দম বন্ধ কিসে হয় না বলতে পারিস তোর!

কাঞ্চন আর কথা খুঁজে পায় না। ছোড়দির কাছে শরীরের কোনও অজুহাতই পাত্তা পাবে না জানে। তবু মাঝে মাঝে বলে ফেলে সত্যি বোকা হয়ে যায়। কথা খুঁজে পায় না।

গেট খুলে ঢুকলে কাঞ্চন সাইকেল নিয়ে বাইরে দাঁড়িয়ে থাকল। তার পৌঁছে দেবার কথা। ছোড়দি রাস্তায় একটা কথাও বলেনি। সাইকেলটার দিকে মাঝে মাঝে তাকিয়েছে। সাইকেল না থাকলে ছোড়দি তাকে নিয়ে রিকশায় উঠে বসতে পারত। তারপর ঘুরে ফিরে হাওয়া খেয়ে বাসস্ট্যান্ডে ছেড়ে দিয়ে আসতে পারত। সাইকেলটা সব

নষ্টের মূলে। আসার সময় সাইকেলে আসা আর ঠিক হবে না, ছোড়দি যেন কথা না বলে বুঝিয়ে দিতে চায়।

কী হল দাঁড়িয়ে থাকলি কেন। আয়। রাখহরি, দরজা খুলে দে।

রাখহরি দরজা খুলে দে বলার কোনও অর্থ হয় না। গেটে শব্দ হলেই বারান্দার দরজা খুলে যায়। প্রতিবেশীরা বাড়িটাকে খুব সুনজরে দেখে না। তার সঙ্গে ছেলেছোকরা থাকে, সে একা বাড়ি ঢোকে না, এমন একটা অহঙ্কার থেকে, অথবা অপমান থেকে জ্বালা ভিতরে—যেন সগর্বে ঢুকে যাওয়া। সঙ্গে যেই থাকুক, কাউকে সে পরোয়া করে না।

না ছোড়দি, আমার দেরি হয়ে যাবে।

দেরি না হয় হলই। তোর সঙ্গে আমার কিছু জরুরি কথা ছিল।

আমার সঙ্গে!

কেন জরুরি কথা থাকতে পারে না তোর সঙ্গে?

পরে হলে হয় না। দেরি হয়ে গেলে ফিরব কী করে!

নাটক করবি না রাস্তায়। কচি খোকা! ফিরব কী করে। রোজ ফিরতে হয় না! না ফিরলে কবে জলে পড়ে গেছিস বল।

মা ভাববে।

মা বাবারা ভাবার জন্যই থাকে। ভাবুক। একদিন খবর না দিয়ে থেকে গেলে মাসিমা জলে পড়ে যাবেন না। ভিতরে ঢোক। কেবল মা আর মা!

কাঞ্চন ঢোক গিলে বলল, ছোড়দি তুমি তো জানো, টেনশান হলেই মার অসুখটা বাড়ে। অসুখটা বাড়তে দেওয়া কি উচিত হবে।

ধুস! এই রাখহরি, বাবুর সাইকেলটা ঘরে তুলে রাখ। আমাকে জ্বালাবি না। আয় ভিতরে। যার টেনশান তার। তোর কেন এত মাথাব্যথা।

এরপর কাঞ্চনের সাহস থাকার কথা না। এতটা জোর দিয়ে যে বলতে পারে, আয় ভিতরে, তাকে সহজে এড়ানো কঠিন।

সে সুবোধ বালকের মতো পিছু পিছু উঠে গেল। সিঁড়ি ধরে দোতলায়। সন্ধ্যার দু-চারটে নক্ষত্র আকাশে। ঝিলের ওপারে বাঁশবনে ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি উড়ে এসে গোল চক্রাকারে ঘুরছে। দৃশ্যটা দারুণ। এমনকি পাখিদের ছায়া জলের উপর ভেসে যাচ্ছে। পাড়ের গাছপালায় মৃদুমন্দ বাতাস। চাতালে বসলে সত্যি শরীর জুড়িয়ে যায়।

কী খাবি! চা না কফি।

দাও কিছু।

হাত-মুখ ধুয়ে নে। ফ্রেশ হয়ে বোস। আসছি। বলে ছোড়দি উঠে গেল। সে ভেবে পাচ্ছে না কী জরুরি কথা থাকতে পারে তার সঙ্গে। তার মতো স্বভাবের মানুষের সঙ্গে কোনও জরুরি কথাই থাকতে পারে না। তবু শুধুশুধু বসিয়ে রাখা। কবিতা পড়ে শোনাতে পারে। সে যেমন কবিতা লিখলে ছোড়দিকে পড়ে শোনায়, এবং ছোড়দির অভিমত ছাড়া কোনও কাগজেই তার কবিতা ছাপতে দেয় না—কারণ ছোড়দির মধ্যে কবিতার কান তৈরি হয়ে গেছে। শুনে বলবে, 'অভিমত ছাড়া পাল ছেঁড়া নৌকায় উঠবেন না। অভিমত ছাড়া নদীর পাড়ে কেউ যদি যায়'—এই লাইনটা তুই তুলে দিলে পারতিস। খটকা লাগছে। বেসুরো। তুই জোরে জোরে পড়। ঠিক বুঝতে পারবি।

তেমনি সেও ছোড়দির কবিতার লাইন ঠিক করে দেয়। একটি শব্দ, কিংবা সামান্য চিত্রকল্প যে কবিতার মহিমা কত বাড়িয়ে দিতে পারে ছোড়দি জানে।

ছোড়দি কত অল্প সময়ের মধ্যে ফ্রেশ হয়ে হাতে ট্রে নিয়ে হাজির। কিছু ঝালমুড়ি, সামান্য নোনতা বিস্কুট—আর এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল ট্রেতে সাজানো।

ছোড়দি ওকে কফি দিয়ে, নিজের পেয়ালাটা টেনে নেবার আগে ঠাণ্ডা জলটা এক নিঃশ্বাসে শেষ করে দিল। বিকেলের দিকে গরম পড়ে—গুমোট গরম, ঠাণ্ডা এক গ্লাস জল তারও খেতে ইচ্ছে হল—তেষ্টা পাচ্ছে। কিন্তু চাইতে পারছে না।

রাখহরি আছিস!

বাবু ঠাণ্ডা জল খাবে। মিশিয়ে দেব। না পুরো ঠাণ্ডা।

মিশিয়ে দাও। বেশি ঠাণ্ডা খেলে গলা ধরে যেতে পারে।

ছোড়দি টের পেল কী করে তার জলতেষ্টা পেয়েছে। আগেই পেয়েছিল, না ছোড়দি ওর সামনে জল খেয়ে তার ভিতরে তেষ্টা আছে এমন মনে করিয়ে দিতে চাইল। এও হতে পারে, ছোড়দি জানে, তার তেষ্টা আছে, তবে তার তেষ্টা নিবারণের উপায় কারও জানা নেই। নলিনীর তো নয়ই, এমনকি বাণীও কিছুটা হয়তো বোঝে। সবটা বোঝে না। কিছুটা বোঝে বলেই চুলের তোয়ালেটা খুলে ফেলে তার হাতে ধরিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু ছোড়দি সবটাই বোঝে।

সে জলটা ঢোক গিলে খেল না। এক নিঃশ্বাসে সাবাড় করে দিল। যা তার কোনওদিনই হয়নি।

আচ্ছা, একটা কথা বলব।

কাঞ্চন ছোড়দির সুন্দর মুখের দিকে তাকাল।

তুই তো আমার সঙ্গে শুয়েছিলি!

সে বোকার মতোই অবাক হয়ে বলল, আমি শুয়েছিলাম!

তুই বলাটা বোধহয় ঠিক হল না। আমি তোর পাশে গিয়ে শুয়েছিলাম। হাত দিতেই গুটিয়ে গেলি। কিছু করব না এই কড়ারে পাশে শোবার সুযোগ পাই বলতে পারিস।

না মানে তোমার অসুবিধা হবে। সীতেশদাই বা কী ভাববেন।

সীতেশদা তোকে মানুষ মনে করে ভাবিস! তোর তো সাহস কম না! সীতেশদা কেন, কিরণদাও তোকে শামুক ছাড়া কিছু ভাবে না।

শামুক কেন!

শামুকের মতো গুটিয়ে থাকিস বলে!

কাঞ্চন বুঝল না, এ-সব প্রসঙ্গ জরুরি কথা হয় কী করে! সে তো কতবার শুনেছে পৃথিবীর কাছে, 'শামুকের খোলে সে লক্ষ কোটি বছরের ইতিহাস হয়ে থাকে, এইভাবেই সে কলমি লতা কিংবা জলজ ঘাসে লক্ষ কোটি বছর পার করে দেয়'—কোনও কবিতার অনুষঙ্গ থেকেই তার সম্পর্কে শামুক শব্দটির প্রয়োগ। এতে তার রাগ কিংবা ক্ষোভ নেই—কিন্তু একই কথা বারবার জরুরি কথা হয় না, ছোড়দি ঠিক কী কথা বলতে চায়! তার পাশে এসে শুয়েছিল, কিছু করব না কড়ারে ছোড়দি তার সঙ্গে সারারাত শুয়েছিল। সত্যি কিছুই করেনি। খুব সকালে কখন উঠে গেছে টেরও পায়নি। সেও কী করে একজন নারীকে নিয়ে, ঠিক নারী বলা কি ঠিক হবে, আরও কিছু অধিক—ছোড়দি না থাকলে, ছোড়দির কথা না ভাবলে সে কবিতার কোনও শব্দই খুঁজে পায় না, তার বাহুমূল এবং উরু থেকে স্তনের নির্যাস দূর থেকেও অনুভব করা যায়। সে যে কতবার একইভাবে চিত হয়ে প্রিয় কবিতা পড়তে পড়তে কিংবা কবিতা লিখতে লিখতে ছোড়দিকে ভেবে থাকে, ছোড়দির সব কিছু সে দেখতে পায়, ছোড়দি শুধু সুন্দরই নয়, তার সব কিছুই এত

সুন্দর—ছোড়দিকে সে একদিন বলেও ফেলেছিল, তুমি এত সুন্দর, তোমার সব কিছুই খুব সুন্দর, না ছোড়দি!

সব কিছু বলতে সে যে ছোড়দির রমণের জায়গাগুলিও বুঝিয়েছে ঠিক তা নয়। কিন্তু ছোড়দির চোখ-মুখ সহসা কেমন লালচে হয়ে গেল। ছোড়দি দৌড়ে ঘর থেকে কোথায় গিয়েছিল তাও জানে না—যখন ফিরে এল, স্বাভাবিক। একেবারে স্বাভাবিক গলায় বলেছিল, তুই সত্যি বড় ছেলেমানুষ। ছেলেমানুষ হলে, ছোড়দি ছুটে যাবে কেন—তার এই সব কিছু সুন্দর কথার মধ্যে কি কোনও অশোভন ইঙ্গিত ছিল—সে যাই হোক, এই নিয়ে সে নানাভাবে ভেবেছে, ভেবে দেখেছে, ছোড়দিকে সে বারবার কবিতা করে তুলতে চেয়েছে। যেখানে পারেনি, সেখানে সে ব্যর্থ। ছোড়দি বলত, নিসর্গশোভার মধ্যেও নারীর হাত উঠে থাকে তোর কবিতায়—এমন কি জীবনের জলবায়ু এবং ঈশ্বরবোধেও সেই এক নারী—তোর কবিতা কেন তবে ভাল লাগবে না বল।

সেই ছোড়দি তার পাশে অন্ধকারে শুয়ে ছিল। জ্যোৎস্না ঘরে এসে ঢুকে না পড়ে, কিংবা রাস্তার আলো, শোবার আগে তাও লক্ষ রেখেছিল। জানালার পাট বন্ধ করে সে শুয়েছিল কাত হয়ে। চুলের গন্ধ থেকে শরীরের সব ঘ্রাণ তার নাকে উঠে আসছে। কবিতাকে অনুভব করা যায়, স্পর্শ করা যায় না। এমনই ভাবতে ভাবতে সে ঘুমিয়ে পড়েছিল।

ছোড়দিকে অন্ধকারে ছুঁয়ে দেখতে ইচ্ছে হয়েছিল। পারেনি। সাহস হয়নি। সঙ্কোচ, না এক ধরনের বিহ্বলতায় ডুবে গিয়েছিল তাও জানে না। তার মন প্রাণ ভরে ছিল, ছোড়দি তার পাশে শুয়ে আছে ভেবে। নলিনীর মতো তাকে ছিঁড়ে-খুঁড়ে খেতে চায়নি। ছোড়দি তার পাশে বালিকার মতো শুয়ে আছে। সে নড়েনি। একপাশে সরে গিয়ে শুয়েছে। সে চিত হয়নি। যদি গায়ে গা লেগে যায়। অন্ধকার নিবিড় হলে গায়ে গা লেগে যাওয়া ঠিক না, এক রিকশায়, কতবার এই বাড়ি ফিরেছে তারা, তখন এমন কোনও বোধেই সে আক্রান্ত হয়নি। কিন্তু রাতযাপনে নারীর সুষমা অন্যরকমের হয়ে যায়। দিনের আলোয় পাপ থাকে না। অন্ধকারে পাপ থাকে। সে একপাশ হয়ে প্রায় মরার মতো পড়েছিল। ছোড়দিও। শুধু পাখার হাওয়া আর তার ঘোর শব্দ, দেয়ালে মাথা কুটে মরেছে। কিংবা বেশি সাহসী হলে, ঘুমের ঘোরে ছোড়দির শাড়ি সায়া তছনছ করে দিতে চেয়েছে। তার বেশি কিছু কি আর অন্ধকার দিতে পারে। হাওয়ায় শাড়ি সায়া ওলটপালট হয়ে যায় সে জানে।

তারপরই মনে হয়েছিল, ছোড়দি কি অনাবৃত হয়ে শুয়েছিল তার পাশে। কেমন শিহরন। এমন ভাবাও পাপ! কারণ অন্ধকার ঘরে ছোড়দি কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে কী করছিল টের পায়নি। শঙ্কাও কম না। সে চোখ বুজে পড়ে আছে। সায়ার দড়ি আলগা করতে গেলেও শব্দ ওঠে। শাড়ি খুলে ফেলারও শব্দ হয়। এমন কিছু অপার্থিব শব্দমালা অন্ধকারে ঘিরে রেখেছিল তাকে। তারপর উঠে এলে খাট সামান্য নড়ে উঠল। পাশ ফিরে শুয়েছে। খাট নড়লে এমনও টের পাওয়া যায়। তারপর আর সব চুপচাপ। অন্ধকার শুধু থাকে জেগে।

কী রে কফি যে ঠাণ্ডা হয়ে গেল। চুপচাপ বসে আছিস। আমাকে দেখছিসও না। মাথা গোঁজ করে বসে থাকলি কেন। শামুক বলায় কষ্ট পাচ্ছিস! শামুক না বলে শংখকুমার বলব? কী চুপ করে আছিস কেন!

না না। শামুককে তো শামুকই বলতে হবে। কষ্ট পাব কেন!

এবার মুগুর প্রয়োগ করে খোলটা ভেঙে ফেলা দরকার।

তার মানে। আমি যে মরে যাব। খোলটা ভেঙে ফেললে একটা পাতিহাঁস গিলে ফেলবে।

ছোড়দি হেসে ফেলল।

শংখকুমার খোলস ছেড়ে রাজকন্যার পাশে এসে শুত না। তুই সত্যি একটা কাপুরুষ। তোকে নিয়ে যে কী করব। ক্ষোভে দুঃখে রাজকন্যা শংখটাকে সমুদ্রে ফেলে দিল মনে নেই?

তাতে কি শংখকুমারের কোনও ক্ষতি হয়েছে?

কাপুরুষকে কাপুরুষ বললেও রাগ করা যায় না। যে যা বলে, সে তা মেনেও নেয়। মুগুর দিয়ে ভাঙলেও রাগ করা যায় না। কোনও পাঁতিহাস তাকে গিলে ফেলবে তাই বা ভাবে কী করে! রূপকথার শংখকুমারের তো কোনও ক্ষতিই হয়নি। প্রতিবাদ করে কী হবে! নলিনী ক্ষেপে গেলে বলবে, তুমি কাঞ্চনদা ধ্বজভঙ্গ কি না তাও টের পেতে দিলে না। ব্যবহারে বোঝা যায়। এমন চেপেচুপে রাখো, যেন কেউ তোমার ওটা কেটে ফেলে দেবে। একদিন তাই দেব ভাবছি।

তারও সে প্রতিবাদ করেনি। যদি সত্যি তাকে চেপেচুপে ধরে কেটেই দেয়—সেই আতঙ্কেই নলিনী ঘরে ঢুকলে সে ঘরের বার হয়ে যায়। যা চণ্ডরাগ, নলিনী সব পারে।

আচ্ছা কাঞ্চন, তুই তো সবই বুঝিস দেখছি।

কাঞ্চন কিছু বলল না। অন্ধকারে ঝিল এবং নক্ষত্রের প্রতিবিম্বে সে যেন ডুবে আছে।

তোর দ্বিতীয় কিস্তি শুনে বুঝলাম, সাবালক হয়েছিস।

সাবালক নই আমি বলছ! কিংবা ছিলাম না। পাঁচ সাত বছর হয়ে গেল কবিতা লিখছি। কিস্তি শুনে শেষে ঠিক করলে সাবালক? কি জানি!

সে আবার অন্যমনস্ক হয়ে গেল। পাশের বিশাল জলাশয়টি আশ্চর্যরকমের উল্লাসে মেতে উঠছে। বায়ুতাড়িত জলকণা যেন এই ছাদেও উঠে আসছে। নক্ষত্রের প্রতিবিম্ব ছিন্নভিন্ন। জলাশয় এবং নক্ষত্রকে আর আলাদা করে চেনা যাচ্ছে না।

মুশকিলটা কোথায় জানিস কাঞ্চন। তুই সবই বুঝিস—শুধু প্রয়োগের গুরুত্বকে অশালীন ভাবিস। এটা ভাবলে বড় খারাপ লাগে। তোকে মানুষ করে তুলতে না পারলে আমার যে কী হবে! কী করব বুঝে পাচ্ছি না। কার খপ্পরে পড়ে যাবি শেষে। কোথায় নিয়ে তুলবে। তোর কবিতা বুঝবে না, শুধু তোর শরীর বুঝবে। শরীরের সঙ্গে কবিতাও থাকে এটা অধিকাংশ নারী পুরুষই বোঝে না।

জরুরি কথা আছে বলে তাকে বাড়িতে নিয়ে এসেছে। জরুরি কথা কখন বলবে ছোড়দি! শুধু তাকে নিয়ে পড়ে থাকলে কি জরুরি কথা কখনও আর শুরু করা যাবে।

সে বলল, না বুঝলে তোমারই বা কী ক্ষতি আমারই বা কী ক্ষতি বল! বরং কী জরুরি কথা বলবে বলেছিলে, এখনও বের হলে চলে যেতে পারব। রাস্তায় লোকজন থাকবে। ভয় করবে না।

জরুরি কথাটা যে কী আমি নিজেও ঠিক বুঝতে পারছি না। আজ দেখলি তো কিরণদাকে! বশিষ্ঠদা কেমন ভয় দেখাচ্ছে মাসিমাকে! কিরণদা যন্ত্রণায় ছটফট করছিল বুঝতে পারছিলি!

বশিষ্ঠদাকে আমিও দু একবার দেখেছি, বাগানে দাঁড়িয়ে বাড়িটাকে দেখছে।

বাড়িটাকে না, দেখছে নিজের জীবনটাকে।

তার মানে ?

তুই তো জানিস, জানি মানি এখন সন্ন্যাসিনী।

ওর দুই বোনের নাম জলি মলি! নাম জানতাম না।

আসলে কিরণদা ছাড়া মাসিমার বাকি পাঁচটি সন্তানই জারজ।

জারজ বলছ!

হ্যাঁ জারজই বলছি। পাঁচটি সন্তানই বশিষ্ঠদার। কিরণদার বাবা নিশিনাথ জানতেন সব। আসলে বশিষ্ঠদার মধ্যে শরীরও ছিল কবিতাও ছিল। নিশিনাথের শুধু শরীর ছিল। যে কোনও নারীকে বুঝতে হলে তার শরীরের কবিতাটিও বুঝতে হবে। না বুঝতে পারলে অশান্তি, তিক্ততা, ডিভোর্স। মাসিমাকে দেখলে মনে হয় মনে কিংবা শরীরে কোনও পাপ আছে! আভিজাত্য, রুচিবোধ কোনও কিছুর খামতি আছে! স্নেহশীলা, কর্তব্যপরায়ণ, অতিথি অভ্যাগতদের যত্নে কোথাও কোনও ত্রুটি আছে?

না। আচ্ছা ছোড়দি বাণী কি সন্ন্যাসিনী হয়ে যাবে! মলি জলি জানল কী করে!

পাগল! শরীরের এই দাহ নিশ্চয়ই মাসিমার মধ্যে তারা টের পেয়েছিল। কিরণদাও জানে। বশিষ্ঠদা অসুস্থ। মাসিমা মনে করে এই অসুস্থ অবস্থায় সব না বলে দেয়। কনফেশান বলতে পারিস। বাইরে গিয়ে দাঁড়িয়ে বাড়িটার দিকে তাকিয়ে থাকলে এই আতঙ্কটা পরিবারে আরও ছড়িয়ে পড়ে। মাসিমার শরীর কেমন করে! মাথা ঘোরে। বিছানা থেকে উঠতে পারেন না।

আমি বুঝছি না ছোড়দি, বশিষ্ঠদাকে তাড়িয়ে দিলে পারতেন মেসোমশাই। পারলেন না কেন।

কেউ চায়, নিজের স্ত্রী পালিয়ে যাক। তাড়িয়ে দিলে মাসিমাও সঙ্গে চলে যেতেন। এ-সব ক্ষেত্রে খুনটুন হয়ে থাকে, তবে শশীনাথের পুত্র নিশিনাথ পরিবারের মর্যাদার কথাই বেশি ভেবেছেন আর জ্বলে পুড়ে খাক হয়েছেন। না পেরে নিজেই নিখোঁজ হয়ে গেলেন।

আচ্ছা ছোড়দি, বাণী কি সন্ন্যাসিনী হবে!

তোর কি মাথা খারাপ আছে! এক কথা বার বার বলছিস!

মাথা খারাপ!

সে তার মাথায় হাত দিয়ে চুল টানতে টানতে বলল, বুঝতে পারছি না।

কিছুই বুঝতে পারিস না। ইচ্ছে করে না বোঝার ভান করছিস। বাণী তো আর জানে না, সে নিশিনাথের কন্যা নয়। বশিষ্ঠদা তার বাবা। জানলে সন্ন্যাসিনী হওয়া অসম্ভব না।

তবে আমার কেন মনে হল, ওর ক্লাশ ফোরের জীবন চার বছর বাদে এক আছে কি না টের না পেলে সেও সন্ন্যাসিনী হয়ে যাবে। চুলের তোয়ালে ছুঁড়ে দিয়ে গেল। আমি গন্ধ শুঁকে টের পাই কি না, এক জীবন নয়, বহু জীবন।

কিছু টের পেলি।

পেয়েছি।

কী টের পেলি।

সে আর চার বছর আগেকার জীবনে নেই। শরীরের নানা জায়গায় ফুল ফুটতে শুরু করেছে। ফুলের গন্ধ পেলাম।

ফুলের গন্ধ পেলি।

হ্যাঁ পেলাম।

তোর ছোড়দির সেই জীবন শেষ। ফুল নেই, ছেঁড়া পাপড়ি—তাও মাঝে মাঝে মনে হয় শুকিয়ে যাচ্ছে। তুই এত জানিস, শুধু তার প্রয়োগ সম্পর্কে সচেতন নস। তোকে যা আছে তাই দিয়ে অন্তত প্রয়োগের ক্ষেত্রটিকে তৈরি করে দিতে চাই।

প্রয়োগের ক্ষেত্র বলছ কেন।

তুই সব জানিস। প্রয়োগ করতে শিখিসনি। তোর কবিতা পড়ে মনে হয়েছে, কোনও গাছের নীচে এসে আছিস। ফুল ফোটা দেখছিস। ফুল ঝরে গেলে, বিমর্ষ মুখে উঠে যাচ্ছিস। ফুল তুলে যে গন্ধ নিতে হয় জানিস না। এটাই জীবনের প্রয়োগের ক্ষেত্র। যা তোর মধ্যে বিন্দুমাত্র নেই। যখন উঠে যাচ্ছিস, গাছ তোকে বলছে, আবার ফুল ফুটবে। মন খারাপ করার কী আছে। আমরা তো ঋতুর বিকাশ মাত্র। বার বার ঋতুতে ঋতুতে ফিরে আসি। যে যার মতো ফুটে যাই, ঝরে যাই। আমরা শেষ হয়ে যাই না।

আমার কবিতায় এ-সব আছে বলছ।

তুই ভুলে যাস। যাকগে, এক সাধুর জীবনকাহিনীর দ্বিতীয় কিস্তিতে ফুল্লরার চরিত্রটি সুন্দর। সাধুর চরিত্রটি কামুক। সে শরীরের ভাল মন্দ বোঝে না। মন বোঝে না। শরীর শুধু বোঝে। পাছা টেনে শাড়ি তুলে এগিয়ে দেওয়ার সময়, তোর মনে আদৌ কি কোনও যৌন চিন্তা পীড়ন করেনি।

ছোড়দির সামনে ধরা পড়ে যাবে ভেবে, মুখ নিচু করে পায়ের কাছে কী যেন খুঁজছে। সে ছোড়দির প্রশ্নের কোনও উত্তর দিল না। আসলে সে বলতে সাহস পেল না, পীড়ন করেছে। বললে ছোড়দির কাছে খাটো হয়ে যাবে।

কি রে কথা বলছিস না কেন।

না মানে, পায়ে একটা মশা কামড়াচ্ছে।

মশাটাকে তাড়াতে পারছিস না।

খুঁজছি।

ওটা উড়ে গেছে।

আমি উঠি ছোড়দি। রাত আটটা দশ। ঠিক চলে যাব।

কথার জবাব না দিয়ে উঠতে পারবি না।

এটাই কি তোমার জরুরি কথা।

জরুরি কথা। শাড়ি সরিয়ে পাছা এগিয়ে দিলে কী হয়।

এত সুন্দর তুমি ছোড়দি, আর—মানে, না না—

আমি সুন্দর কে বলেছে। আমার পক্ষে শোভন নয়। মুখ লুকিয়ে রাখছিস কেন। কান গরম হয়ে যাচ্ছে। মুখে রক্তের চাপ বোধ করছিস। বল কী হয়, কেন এই অসামান্য চিত্রণ নারী সম্পর্কে দ্বিতীয় কিস্তিতে করতে গেলি।

অপরাধ হয়ে গেছে।

কোনও অপরাধ করিসনি। যা এবারে ওঠ। স্নানটান সেরে নে। এখানেই খাবি। রাতে যেতে হয় সীতেশ যাবে। দরকারে যে করেই হোক খবর পাঠাবে। একসঙ্গে খাব। কবিতা পাঠ করব। তারপর রাতে আজ আবার আমি তোর পাশে শুয়ে থাকব। দেখি পারিস কি না!

ওর কান মাথা গরম হয়ে গেল। শরীরে কেমন উত্তেজনা বোধ করছে। মনে হয়

চোখ জ্বালা করছে। সে কিছুটা ভিতরে অস্থির হয়ে পড়ছে। ঘর অন্ধকার। চুপি চুপি কেউ ঢুকছে। সে এক নারী। শরীর অনাবৃত করে সেদিন শুয়েছিল কি না জানে না। কিছুই জানে না। নিজের খুশি মতো সে তার পৃথিবীকে তৈরি করে নেয়। অনাবৃত যদি থাকে, যদি তাই হয়, ছুঁয়ে অন্তত দেখতে পারে, হাতে পায়ে জঙ্ঘায় এবং উরুমূলে—না সে শুধু জানতে চায় ছোড়দি সত্যি তাকে সাহসী করে তোলার জন্য এত বড় আত্মত্যাগে রাজি হবে কি না। নিজেকে অনাবৃত করতে রাজি থাকবে কি না।

ছোড়দি নীচে নেমে গেল কী কারণে সে জানে না। সে একা বসে আছে। মুখ বিমর্ষ। কেমন এক গণ্ডগোল সৃষ্টি হয়ে গেছে ভিতরে। থেকে যাবার এমন আগ্রহ সে জীবনেও টের পায়নি। মার কথা মনে থাকল না। নির্জন রাস্তায় বেশি রাত হলে একা যেতে ভয় পায়। বাড়ি ফিরতে হলে সে তাড়াতাড়ি বের হয়ে পড়ে। ছোড়দির এই আমন্ত্রণ সে যেন কিছুতেই উপেক্ষা করতে পারছে না। কেমন আলগা করে দিচ্ছে—মা রাতে বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকবে, ঘর-বার করবে, ঘুম হবে না। দুঃস্বপ্ন দেখবে। এমনকি ক্ষোভে দুঃখে কিছু নাও খেতে পারে।

আমার কথা ভাবলি না।

কী করব, ছোড়দি এমন করে থেকে যেতে বলল, কিছুতেই পারলাম না।

ছোড়দি তোর সর্বনাশ।

মা! কী বলছ! আমাকে খোল থেকে বের করে আনতে চায়। লেবার রুম, হিরা মাসির সেই আতঙ্ক, পেট খালি থাকে না, নলিনীর তাড়া থেকে কেমন দিন দিন গুটিয়ে যাচ্ছি। ছোড়দি সব টের পেয়ে গেছে। সাধুর জীবনকাহিনীর দ্বিতীয় কিস্তি বোধহয় আমার লেখা উচিত হয়নি।

তোর ছোড়দি তোকে খাবে।

তখনই সিঁড়িতে পায়ের শব্দ। বোধ হয় কেউ উঠে আসছে। সিঁড়ির দরজায় এবং খোলা ছাদে আলো জ্বলা। কিছু ফুলের টব—দুটো বনসাই, এবং মানিপ্ল্যান্টের গাছে একটা জোনাকি অন্ধকার থেকে উড়ে আলোর ভিতর ঢুকে রাস্তা হারিয়ে ফেলেছে। সে ফের অন্ধকারে ভেসে পড়ার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছে। পারছে না।

জোনাকির জন্যও সে কষ্ট অনুভব করে।

জোনাকি পোকা অন্ধকার ভালবাসে। সে উঠে দাঁড়াল। জোনাকি পোকাটাকে ধরার চেষ্টা করল। উড়ছে। উড়ে উড়ে অন্ধকারে হারিয়ে যেতেই কী খুশি!

আর তখনই ছোড়দি খোলা ছাদে ঢুকে কেমন ভাল মানুষের মতো বলল, কী রে দাঁড়িয়ে আছিস কেন! যা। কত রাত হয়ে গেল! ফিরবি কী করে! সীতেশদা তোর এসে গেছে। সীতেশদাকে বলে চলে যা।

সে হতবাক।

সীতেশও খোলা ছাদে ঢুকে গেল।

এত রাতে যেতে পারবি! আমি তো ভাবলাম, ছোড়দিকে ছেড়ে দিয়েই চলে গেছিস। ছোড়দি নিশ্চয়ই ছাড়ল না। কড়া ধমক খেয়েছিস। মুখ ব্যাজার। কেন যে ও-সব ছাইপাঁশ লিখতে যাস।

সীতেশ ওকে নিয়ে পারা যাবে না। সেই থেকে বসে আছে। বাড়ি যাচ্ছে না। বলছি বাড়ি যা। কত রাত হয়ে গেল কিছুতেই উঠছে না। কেবল বলছে ছোড়দি আর একটা কবিতা শোনো। ছোড়দি এই কবিতাটা পড়ি, প্লিজ। প্লিজ শোনো।

কী কবিতা !

শিরীষ গাছের নীচে/ পেটে পিঠে এক হয়ে মেয়েটা ফুটপাথে মরে আছে/

কী কবিতা !

ভুবনেশ্বরী যখন/ ভুবনেশ্বরী যখন শরীর থেকে একে একে তার রুপোর অলঙ্কার খুলে ফেলে/ আর গভীর রাত্রি নামে তিন ভুবনকে ঢেকে

কী কবিতা !

বলেছিলাম, তোমায় নিয়ে যাব অন্য দূরের দেশে/ সেই কথাটা ভাবি/ জীবনের ওই সাতটা মায়া দূরে দূরে দৌড়ে বেড়ায়/ সেই কথাটা ভাবি/

কী কবিতা !

জল বাড়ছে/ কেউ জানে না, গোপনে গোপনে জল বেড়ে উঠছে/

পাগল ! তোর নিজের কবিতা একটাও না। এ যে সব বড় কবিদের কথা। তুই নিজের কবিতা পড়তে এত সঙ্কোচ বোধ করিস কেন।

ছোড়দি তার অনর্গল মিছে কথা বলে গেল। মুখে এতটুকু আটকাল না। তার যে বড় আকাঙ্ক্ষা ছিল আজ সে ছোড়দির সঙ্গে শোবে।

আজ না হয় থেকেই যা কাঞ্চন। আমিও বসি। বেশ জমে যেতে পারব। সারা রাত কবিতা পাঠ। কী রাজি ? পাশে তোর ছোড়দি।

না না। ওর মা টেনশানে থাকবে। বাবুকে থাকার জন্য কম সাধাসাদি করিনি। সীতেশদা এলেই উঠে পড়ব। থাকতে যখন চাইছে না, জোর করতে যেয়ো না।

তার বাক্য সরছে না। এ-ভাবে সে কখনও নিরাশ হয়নি। ছোড়দি জানে, গোপনে জল বাড়ছে। সেও আজ টের পেল, গোপনে জল বাড়ছে। দু'জনই জানে গোপনে জল বাড়ছে। ছোড়দির অনর্গল মিছে কথাও—গোপনে জল বাড়ছে মনে হল।

ছোড়দি জোর করে ধরে রেখেছিল।

একসঙ্গে খাব। কবিতা পাঠ করব। তারপর রাতে আজ আবার আমি তোর পাশে শুয়ে থাকব।

সে নির্বাক। হতভম্ব। এত রাতে, রাস্তা নির্জন—ছোড়দি তাকে চলে যেতে বলছে। তার জন্য কোনও মায়াদয়া পর্যন্ত নেই। নির্জন রাস্তায় গেলে মনে হয় গাছপালা সব নুয়ে পড়ছে। হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে। হেরম্ব সাধুর গুপ্তবিদ্যায় তার কোনও বিশ্বাস নেই। ধর্মেও না। সব বুজরুকি। কুসংস্কারও না। তবু কেন নির্জন রাস্তা এবং অন্ধকার এত তাকে কাবু রাখে ! পৃথিবী শুনশান, শুধু কীটপতঙ্গের আওয়াজ, রেলের ধারে, ফার্মাসিস্টের বউ কাটা পড়ে গেছে, দড়িতে ঝুলেছে এক নারী কোনও কয়েতবেল গাছে। সবাই যেন পৃথিবী জনবিরল হয়ে গেলে তাকে তেড়ে আসে।

সে সিঁড়ি ধরে নেমে যেতে থাকল।

সীতেশদা নামছে।

ছোড়দি উপরে। নামছে না।

কিছু খেয়েছিস তো।

খেয়েছি।

সাইকেল বের করে দিল রাধহরি।

সাইকেলে উঠলে, সীতেশ বলল, সাবধানে যাস। রাত বেশ হয়ে গেছে। ভয়ে জোরে সাইকেল চালাস না। ভয় পেলে জোরে জোরে কবিতা পাঠ করবি। ভয় কেটে

যাবে।

ব্যালকনিতে ছোড়দি। কাঞ্চন মুখ তুলতেই বলল, কাল আসবি। কথা দিচ্ছিস তো। মাসিমাকে বলে আসবি কেমন।

কাঞ্চন ক্রমে অদৃশ্য হয়ে গেল। অন্ধকারে তাকে আর দেখা গেল না। সীতেশ দরজা বন্ধ করে উঠে আসছে। সিঁড়িতে পায়ের শব্দ। এত তাড়াতাড়ি তার ফেরার কথা ছিল না। তার শরীরের কথা ভেবেই সুস্থ অবস্থায় সীতেশ ঘরে ফিরেছে।

সে জানে তাসের আড্ডায় জমে গেলে সীতেশের বাড়ি ফেরার কথা মনে থাকে না। কিছুটা মাতাল হয়ে ফেরে।

অথচ ফিরে এল। একেবারে স্বাভাবিক, একেবারে সুস্থ অবস্থায়।

সংশয়। কাঞ্চনের দ্বিতীয় কিস্তি তাকে সংশয়ে ফেলে দিয়েছে।

যাক কাঞ্চন মানুষ হয়ে উঠছে—সীতেশ তাকে গুরুত্ব দিচ্ছে।

আর তখনই মনে হল, সীতেশ তাকে ডাকছে।

সে সাড়া দিতে পারছে না। সারা শরীরে গ্লানি, অনর্গল মিছে কথা বলে সে নিজেও কিছুটা হতভম্ব। তার কিছু ভাল লাগছে না। ছাদের অন্ধকার দিকটায় ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে শুয়ে আছে। কেন যে এত মিছে কথা বলতে গেল। কাঞ্চন থাকলে কী ক্ষতি ছিল! এত রাতে সাইকেলে সে কখনও যায় না। যাওয়ার ইচ্ছেও ছিল না। যেন সে জোর করেই পাঠিয়ে দিল।

তুমি এখানে বসে আছ?

ঝিলের হাওয়ায় তার শাড়ি সায়া ঠিক থাকছে না। সে শুয়ে আছে।

অন্ধকারে বসে আছ কেন?

সীতেশ পাশে একটা চেয়ার টেনে বসল।

কোনও সাড়া নেই।

শরীর খারাপ?

না।

তাকে জড়িয়ে আদর করতে গেলে ধড়মড় করে উঠে বসল।

ছাড়ো বলছি।

কী হয়েছে তোমার?

কিচ্ছু হয়নি। ছাড়ো।

কিন্তু সীতেশকে সে জানে। শরীর ছাড়া কিছু বুঝবে না। ছাড়বে বলে মনে হয় না। এই অন্ধকার এবং ঝিলের নির্জনতা তাকে গ্রাস করবেই। সীতেশ জানে, সব জানে, অনাবৃত করা ছাড়া তার উপায়ও নেই। এই জোরজার তাকে, কখন যে পাগল করে দেয় সে নিজেও বোঝে না। সীতেশ কী ভাবে যে মুহূর্তে তাকে কব্জা করে ফেলে।

ছাদের দরজা বন্ধ আছে?

বন্ধ করে দিয়ে আসছি।

সীতেশ ছুটে গেল দরজার দিকে। দরজার ছিটকিনি তুলে, প্রায় টানতে টানতে তাকে নিয়ে খাটে ফেলল। সে বাধা দিল না। সীতেশ শরীরের বর্বরতা বোঝে, কবিতা বোঝে না। কাঞ্চন কবিতা বোঝে। শুধু কবিতায়, শরীরের বর্বরতা শেষ হয় না।

লুটেপুটে খাচ্ছে। খাক। আরাম, চোখ বুজে আসছে। সীতেশ জানে সব। তার শরীর অনাবৃত থাকলে সীতেশ পাগল হয়ে যায়। সে ক্রমে ডুবছে। ডুবে যেতে যেতে

তার শরীরে আশ্চর্য শিহরন খেলে গেল। সে পাগলের মতো সাপটে ধরল সীতেশকে।

তারপর গভীর রাতে সহসা মনে হল বুকে কষ্ট। গভীর কষ্ট। তার উঠতে ইচ্ছে হচ্ছে না। সায়া শাড়ি খুঁজে বাথরুমে ঢুকে যাওয়া দরকার। তার কেন যে কান্না পাচ্ছিল।

অন্ধকারে কাঞ্চন চলে গেছে, অদৃশ্য হয়ে গেছে। গাছের ছায়ায় বসে নেই কাঞ্চন। ফুল ঝরে গেছে। ফুল আর ফুটবে না। হতাশ হয়ে চলে যাচ্ছে অন্য কোনও বনভূমির দিকে। কাঞ্চন জানেই না, আবার ফুল ফুটতে পারে। আবার বসন্ত এলে কিংবা শীতে অথবা বর্ষায়, যার যেমন বিকাশের ঋতু, সে ঠিকই ফুটবে। গাছ দাঁড়িয়ে থাকে ঋতুর অপেক্ষায়।

কাঞ্চন অন্ধকারে চলে গেছে।

তার কান্না পাচ্ছিল—আসলে নারীরা কবিতার চেয়ে বর্বরতা বেশি ভালবাসে। সীতেশের মধ্যে তা আছে। বশিষ্ঠদার মধ্যেও। নিশিনাথ বোধহয় চাইত শরীরে কবিতা থাক—কাঞ্চন না চলে গেলে এই ভুলটা সে টের পেত না।

গাছপালা, জোনাকির আলো, নীল আকাশ, নক্ষত্রমালা এবং রাতের নৈঃশব্দ্য ঘিরে থাকে কাঞ্চনকে। প্রিয় তার কবিতা। শুধু প্রিয় নয় অনাবৃতা নারী। উপেক্ষার জ্বালা সে বোঝে। ভোর রাতে প্রায় গোপনে নিঃশব্দে উঠে এসেছিল। পাশে শুয়ে বুঝেছে, কাঞ্চন কবিতা চায় নারীর শরীরে। নারী অনাবৃতা হলে কবিতা থাকে না। শুধু শরীর থাকে। বেচারা কবে বুঝবে কে জানে! গাছ তো দাঁড়িয়ে থাকবেই ঋতুর অপেক্ষায়।

পুনশ্চ

মোমের মৃদু আলোয় তারা চুপচাপ বসে।

তারা মাত্র দু'জন।

সীতেশ কেমন ক্লান্ত গলায় বলল, কিছুই মাথায় দিচ্ছে না। কিছু বুঝতে পারছি না। কি যে হয়ে গেল! আমি যে এখনও বিশ্বাস করতে পারছি না। বিশ্বাসঘাতক।

কিরণ টেবিলে মাথা নিচু করে বসে আছে। সহসা কি মনে পড়ায় বলল, ছোড়দিকে খাওয়াতে পারলি!

না। উঠছে না। শ্মশান থেকে ফিরেই ঘরে ঢুকে গেল। ঘরে ঢোকার আগে শুধু আমাকে দেখল। কিছু বলল না। শাড়ি দিয়ে শরীর ঢেকে ফেলল। এত লজ্জা!

আমি একবার যাব। চেষ্টা করব!

যাও। দেখতে পার। যদি ওঠে।

লোডশেডিং। চারপাশ ঘন অন্ধকারে ঢাকা। ছাদের দিকটা খোলা। ঝিল থেকে ঠাণ্ডা বাতাস উঠে আসছে। সারাদিন প্যাচপ্যাচে বৃষ্টি। ঘন কুয়াশার মতো শহরটাকে ঢেকে রয়েছে যেন।

টেবিল ল্যাম্পের ম্লান আলোতে কিরণ দেখল, ছোড়দি পাশ ফিরে শুয়ে আছে। মুখ আঁচলে ঢাকা। কেমন নিঝুম হয়ে আছে এই ঘর, এই আলোর শিখা। শুধু জানালা পার হয়ে ধূসর অন্ধকারে কিছু জোনাকির ওড়াওড়ি টের পেল কিরণ।

দুটো দিন কি গেছে! পুলিশ, মর্গ, শ্মশান এবং পরিচিত মানুষজনের কাছে নানা কৈফিয়ত।

সে শুধু বলেছে, জানি না। মৃত্যুকে স্বপ্নের মতো যদি কেউ ভেবে থাকে, আমরা তার কী করতে পারি বলুন।

স্বপ্ন বলছেন কেন।

নদীর চরায় জ্যোৎস্নায় শুয়ে থাকা, আকাশ নক্ষত্র দেখতে দেখতে শেষ হয়ে যাওয়া, তাকে কষে লাথি মারা যায়—আর কিছু করা যায় কি না ভেবে দেখেনি।

শ্মশানে ছোড়দি গিয়েছে। বন্ধু, আত্মীয় পরিজন, ভিড়, ছোড়দির চুপচাপ বসে থাকা, এবং একাকী কখন ঘরে ফিরে এল ছোড়দি কেউ টের পায়নি। সীতেশ যায়নি শ্মশানে।

সে মাসিমাকে আগলেছে। কিরণ ফিরে এসে লোকজন দিয়ে মাসিমাকে রিকসায় পাঠিয়ে দিয়েছে। ইচ্ছে করলে ছোড়দি থাকতে পারত। আশ্চর্য জেদ, না আমি যাব। আমি বসে বসে দেখব, আগুনে ছাই হয়ে যাচ্ছে। কিরণ বুঝিয়েছিল, মাসিমার কাছে এ-সময় তোমার থাকা দরকার।

ছোড়দির জেদ, কার কি দরকার আমি জানতে চাই না। আমি যাব।

দু-দিন ধরে এত বড় ধাক্কা সামলাতে কিরণ হিমসিম খেয়ে গেছে। দাহ শেষ হলে বাড়ি গিয়েছে সে। মা তার চুপচাপ বসেছিলেন। সে ফিরে গেলে মা যেন হাতে আকাশ পেয়েছেন। কিন্তু কেন যে স্বস্তি পাচ্ছিল না কিরণ। সে নিজের ঘরে একা চুপচাপ শুয়েছিল—কেন, কেন সে মরে গেল।

এই একটা জরুরী প্রশ্ন তাকে পাগল করে দিয়েছে। মাসিমা খাতাটা দিয়ে বলেছিল, বাসায় ফিরে এসে সারারাত কি করেছে জানি না বাবা। সারারাত ওর ঘরে আলো জ্বলেছে। ও-রকম তো কতবারই দেখেছি। ওর খাতা খোলা। ওর চোখ তেমনি অন্যমনস্ক। আমাকে জানালায় দেখেও যেন চিনতে পারেনি। কবিতার খাতা ছাড়া ঘরে ওর কোনো সম্বলও ছিল না। ওটা ওল্টে পাল্টে দেখেছে। কি সব লিখেছে—যত বলি, শুয়ে পড় বাবা, রাত অনেক হয়েছে, এক কথা মা তুমি যাও, এখুনি শুয়ে পড়ছি।

রাতেই ঘর ছেড়ে বের হয়ে নদীর চরায় তবে চলে গেছে। নদী দেখলে তার পরমায়ু বাড়ে। নদীই তাকে টেনে নিয়ে গেল। বিশাল নদীর চরা, ধুধু বালিরাশি, সে শুয়ে আছে নক্ষত্র পতনের মতো। নদী তার পাশে বয়ে গেছে—কে জানে, সে নদীর এই জলস্রোতে মৃত্যুর ইশারা খুঁজে পেয়েছে কি না।

খাতাটা সে নিয়ে এসেছে। খাতায় শুধু তার কবিতা কিছু। আর কিছু নেই, আছে কিছু চিহ্ন এবং তার হস্তাক্ষর।

কিরণ ঘরে বসে থাকতে পারছিল না। নিছক আত্মহত্যার এই বিলাস সে কিছুতেই সহ্য করতে পারছে না। কবিতার নিচে সময় তারিখ লেখা থাকে। সে-রাতে রোগা ভোগা ছেলেটা কোনো কবিতা লেখেনি। তারিখ সময় ছাড়া শুধু কিছু কবিতার পংক্তি লেখা আছে—এ তো সেই কবেকার বিস্ময় নিয়ে ছবির মতো কোনো কবির আশ্চর্য কিছু পদ্যের আঁকিবুকি। তার চেনা কবির মুদ্রিত কবিতা। বিস্ময় এবং শিশিরের শব্দের মতো ঘাসে এবং পাখির ডানায় মিশে গেছেন তিনি—কবে সেই কোনকালে।

কিন্তু কবিতায় এ-লাইন কেন?

তবুও তোমারে আমি কোনোদিন পাব নাকো অসীম আকাশে।

খটকা শুরু।

কিরণ দরজা খুলে বের হয়ে এসেছিল। মা তার জলখাবার নিয়ে আসছেন। শ্মশান থেকে ফিরে সে চপচাপ নিজের ঘরে শুয়েছিল। কেমন বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো এই বাড়ির এক কোণে একাকী।

এখন কিছু খাব না মা। ছোড়দির বাড়ি যাচ্ছি। ফিরতে রাত হলে চিন্তা কোরো না।

রাস্তায় ঝুপ করে লোডশেডিং।

ছোড়দির বাড়ির সামনে এসে দেখেছে, শুধু অন্ধকার।

সে ডাকতেই সাড়া দিয়েছিল সীতেশ। একটা মোমের আলো নিয়ে সিঁড়ি ভেঙে নিচে নেমেছে। খুব আস্তে দরজা খুলে বলেছে, এস।

দু' জনেই উপরে এসে কিছুক্ষণ চুপচাপ বসেছিল। কথা বলতে পারেনি।

এখন এই ঘরে। সে ডাকল, ছোড়দি।

মেয়েটা ধরফর করে বিছানায় উঠে বসল। সেই এক বিহ্বল শরীর নিয়ে। শাড়ি দিয়ে যথেষ্ট ঢাকাঢুকি দেবার পরও যেন তার অস্বস্তি। পায়ের পাতা দেখা যাচ্ছে। শাড়ি টেনে পায়ের পাতা ঢাকার প্রাণান্তকর চেষ্টা।

কিরণ দেখছে।

তারপর বলল, এটা ওর আত্মহত্যার বিলাস ছোড়দি। মন খারাপ করে কি করবে। এস বসি। চা কর। কিছু খাবার থাকলে দিও। বাড়িতে একা ভাল লাগছিল না। চলে এলাম।

ছোড়দি কিছুই বলল না।বিছানা থেকে নেমে প্রায় টলতে টলতে সিঁড়ির মুখে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল। একা নামতে ভয় পাচ্ছে।

কিরণ বলল, এই সীতেশ তোর কাজের লোকটা বাড়ি নেই? ও কোথায়। ছোড়দি, আমাদের সঙ্গে বোসো। একা থাকলে মন আরও খারাপ করবে। তোমাকে নামতে হবে না।

ছোড়দি সহসা কেমন অস্বাভাবিক হয়ে গেল। হাসছে। হাসছে। তারপর কত সহজে বলল, ধুস, তোমরা যে আমাকে শোকার্ত রমনী কেন এত ভাবছ বুঝি না। আমার সঙ্গে কি তার সম্পর্ক।

গত দু-দিনের আচরণের সঙ্গে এই ধুস বলা বাস্তবিকই বেমানান। দু-দিন প্রায় নাওয়া খাওয়া ঘুম কারো ছিল না। ছোড়দিরও থাকার কথা না। সীতেশটা একটু বেশি বউ পাগলা—বার বারই বলেছে, তোমাদের ছোড়দি কিন্তু দাঁতে কুটো গাছটি নাড়েনি। কিছু খেতে গেলেই নাকি তার ওক উঠছে।

কিরণ বলল, ছোড়দি আর দশটি মেয়ে থেকে আলাদা হবে কেন। এমন একটা মর্মান্তিক খবরে সবারই স্তব্ধ হয়ে যাওয়ার কথা। ছোড়দিরও দোষ দেওয়া যায় না। শোনো মিষ্টি ফিষ্টি না। পারো তো আলুর দম, বেশ ঝাল কটকটে করে, আর লুচি। দারুণ উপাদেয় হবে।

আসলে সে পরিবেশ হাল্কা করে দিতে চায়। কারণ যে কোনো কারণেই হোক, ছোড়দির মধ্যে অপরাধবোধ কাজ করতে পারে। কারণ খবর পাবার পরই কিরণের মাথা কিছুটা গরম হয়ে গেছিল—সে চেঁচামেচি করেছে।

ওতো সেরকমের ছেলে নয়। নিশ্চয় কেউ তাকে আমরা অপমান করেছি। সে কে?

কথাটা শুনে ছোড়দির মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেছিল। তারপর মনে হয়েছে, এটা তারও একধরনের পাগলামি। আসলে খবরের মর্মান্তিক সত্যকে সে পোস্টমর্টেম করতে চায়—কি হবে আর—যা হবার হয়ে গেছে। এত রাতে তার বাড়ি ফেরার কথা না। সীতেশের বাড়িতে অসুবিধা থাকলে, তার বাড়িতে চলে যেতে পারত। এমনতো কতবার হয়েছে। গেল না কেন! বাড়ি চলে গেল, কে যেতে দিল, কে বাধ্য করল। এত সব প্রশ্ন মাথায় হুল ফোটাচ্ছিল বলেই, চেঁচামেচি করেছে,তারপর রাগ উপশম হলে উজান

শেষ, নদীর চরায় পড়ে থাকে শুধু বালিরাশি—তার উপর দিয়ে তারা হাঁটছে টের পেয়েই বলেছিল, যাকগে আমি যাচ্ছি।

ছোড়দির কেমন নাবালিকার মতো প্রশ্ন, আমাকে নেবে না? আমি যে ওকে দেখব বলে বসে আছি।

কিরণ যেন নাবালিকার আবদার রক্ষা করছে। বলেছিল, ঠিক আছে যাবে।

ছোড়দি আর নিচে নামল না। সিঁড়ির মুখেই দাঁড়িয়ে আছে। সীতেশই কাজের লোকটাকে ডেকে পাঠাল। ছোড়দি দাঁড়াতে পারছে না। কেমন কাঁপছে।

কিরণ ছোড়দিকে সিঁড়ির মুখ থেকে হাত ধরে নিয়ে এল। বলল, বোসো। বাড়িতে কিছু খেতেই পারলাম না। তিন জনে মিলে খেলে, বোধহয় আমরা সাহস পাব।

গরম লুচি বেগুন ভাজা দিয়ে গেল। আলুর দাম সময় লাগবে—এখন যেন তেন ভাবে কিছু খাওয়া দরকার।

মোমবাতির আলোটা কাঁপছে।

কিরণ বলল, মোমবাতি জ্বালিয়ে রাখলে ঘরটা কেমন ভুতুরে লাগে। বাড়িতে কি তোদের কোনো আর আলো নেই! ছোড়দির ঘরের লম্পটা নিয়ে আসছি।

ছোড়দি কেমন মুখ নিচু করে বলল, না ওটা আনবে না। অন্ধকার ঘরে সে ভয় পাবে!

ওরা দু'জনেই ছোড়দির এমন উক্তিতে স্তম্ভিত। বলছে কি!

কিরণ সীতেশের দিকে তাকাতেই বলল, সারা বিকেল সে ঘরটা সাজিয়েছে। নতুন পর্দা টাঙিয়েছে। টিপয়ে রজনীগন্ধার ঝাড়। এবং ওর একটা ছবিতে বেলফুলের মালা। বিছানায় ফুলের ছড়াছড়ি। লক্ষ্য করনি। ছোড়দি কেবল বলছে, এতেই আমি আরোগ্যলাভ করব। তুমি অন্তত কিছুদিন, এ-ঘরে না ঢুকলে ভাল হয়।

কিরণ কিছুটা বিচলিত বোধ করল। সীতেশ ছেলেমানুষের মতো তারদিকে তাকিয়ে আছে। সে যে খুবই নিরুপায় মুখ দেখে কিরণ টের পেল।

আসলে আমরা সবাই মৃত্যুকে বড় ভয় পাই। সে আমাদের মধ্যে নেই। অথচ টের পাচ্ছি সে আমাদের মধ্যে, আরও বেশি করে বেঁচে আছে। ও তো শহরে এসে ও-ঘরটায় থাকত। ও ঘরে কিছুদিন নাই ঢুকলি। ছোড়দির ইচ্ছে নয় যখন।

সীতেশ ভিতরে ভিতরে ক্ষুব্ধ। স্ত্রীকে কিছুটা নির্লজ্জ বেহায়া ভাবা স্বাভাবিক। সে আর দশটা হবু কবির মতোই তার কাগজের একজন কবি। কবিতা পাগল ছেলে। কিন্তু মৃত্যু এতটা কোনো নারীকে শুচিবাইগ্রস্ত করে তোলে ছোড়দির আচরণ লক্ষ্য না করলে সে বুঝতে পারত না।

কিরণ খেতে খেতে আড়চোখে ছোড়দিকে দেখার চেষ্টা করছে। কিছুই খাচ্ছে না। যতটুকু খাচ্ছে তার চেয়ে বেশি জল খাচ্ছে।

সীতেশও মাথা নিচু করে রেখেছে। যেন এই মৃত্যুর জন্য সেও আংশিক দায়ী। বাড়িতে সে ছিল। জোর করলে ওর ক্ষমতা ছিল না অবাধ্য হয়। বললে থেকে যেত। এটা যে অপমান তারও কেন জানি মনে হয়েছে। ছোড়দি যেন জোর করেই পাঠিয়ে দিল। তারপরই ভাবল, কেন যে আজগুবি ভাবনা, এবং নিজেদের দায়ি করে কেন যে এত কষ্ট পাচ্ছে বুঝতে পারছে না। ছোড়দি যদি কোনো কারণে ওকে অপমান করে থাকে! সে তো বাড়ি ছিল না। ফিরে এসে দেখেছে, দুজনেই দারুণ মুডে আছে। তার খুব ভাল লাগেনি। বার বার প্রশ্ন, কার কবিতা, কী কবিতা।

কত সহজে ছোড়দি সব বলেছে। ওর সামনেই বলেছে।—কিছুতেই থাকতে চাইছে না। চলে যাবে। মাসিমার শরীর ভাল না। থাকলে মাসিমার অসুবিধা হবে।

কিন্তু সে চুপচাপ ছিল, কোনো কথা বলেনি। তারপর একজন তিরস্কৃত তস্করের মতো অন্ধকারে সাইকেল চালিয়ে চলে গেল। ছেলেটার এই আচরণ কিছুতেই মেলাতে পারছে না সীতেশ।

সীতেশ কেমন বোকার মতো বলে ফেলল, আত্মহত্যার রুটটা কি আমরা খুঁজে বের করতে পারি!

ছোড়দি সীতেশের দিকে তাকাল। তাকানোতে ভয় এবং আতঙ্কের আভাস।

কিরণদা বলল, চা, ওসব ফালতু কথা ছাড়। স্বজন বিয়োগের মতো বাড়াবাড়ি করে ফেলছি। ওরে আমাদের তিন কাপ চা দে বাবা। তুই কেরে আমাদের। বিশ্বাসঘাতক কোথাকার।

ছোড়দি টেবিল থেকে উঠে গেল।

আরে চা খাবে না। কি হয়েছে বলত! আমরা কি সবাই শেষে কোনো আধিভৌতিক রহস্যে জড়িয়ে পড়ছি! তুমি কেন বললে, ওঘরের আলো আনা যাবে না। ও একা ভয় পাবে। এটা কি যে করছ বুঝছি না। চিরদিন মুখচোরা স্বভাবের—মায়া তোমার হতেই পারে। আমাদেরও হয়। কষ্ট আমরাও পাচ্ছি। শোকসভায় আমরা ওর কীর্ত্তির কথা বলব। এক্ষুনি ঘরে আলো জ্বালিয়ে রাখার এত কি দরকার বুঝি না। বিছানায় এত ফুলের দরকার।

ও ঘরটায় আজ সে আসবেই। তার কাছে যাব কথা দিয়েছিলাম।

শোনো ছোড়দি, তুমি কিন্তু বাড়াবাড়ি করছ। সীতেশের কথা ভাববে না। তুমি এমন করলে ও কি করবে বল! আর এতে আমরা কি মনে করতে পারি না, এই সংসারে একটা চিতা কবে থেকেই জ্বলছে। তুমি কি একটু বেশি স্বার্থপর হয়ে যাচ্ছ না। সীতেশ চিতার আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যাক, এটা কী তুমি চাও!

কিছুই চাই না। আমার ভয় করছে বলেই আলো জ্বালিয়ে রাখতে বলছি।

আচ্ছা তোমার কি মনে হয় সে মরে গিয়ে তোমার কোনো অনিষ্ট করতে পারে?

না। তার অনিষ্ট করার কোনো ক্ষমতাই নেই। সে জানেই না অনিষ্ট কি! শামুকের মতো অন্ধকারে বসে ছিল পৃথিবীতে। তার নিজস্ব ধারণা, জগত সম্পর্কে অদ্ভুত বিলাসী চিন্তা এবং নাবালকের মতো নারীর আতঙ্ক আমাকে দিনরাত পীড়ন করেছে। তাকে কিরণ দা তোমরা কেউ সাবালক হতে দিলে না।

সীতেশ বলল, কি বলছ যা তা। সাবালক না হলে উপন্যাসের দ্বিতীয় কিস্তিতে এত অশ্লীল বর্ণনা থাকে!

তুমি সীতেশ ও কথা বলবে না। তুমি নিজেই জানো সব। তোমার হামলে পড়ে ছিঁড়ে খুঁড়ে খাওয়ার স্বভাব। আর যার মুখেই মানাক, তোমার মুখে অশ্লীল কথাটা মানায় না।

কি বলছ যা তা!

ঘৃণায় ক্ষোভে সীতেশ উঠে দাঁড়াল।

শোক থেকে দাম্পত্য কলহ—যে মরে গেছে তাকে কেন্দ্র করে আর কোনো খারাপ উক্তি কেউ করুক কিরণ চায় না।

কিরণ চা-এ চুমুক দিয়ে বলল, ওর মরে যাওয়াই উচিত কাজ হয়েছে। এ গ্রহের সে

মানুষই নয়।

ছোড়দি বলল, আমারও মনে হয়।

না হলে কখনও ধূসর অন্ধকারে ছুটে যাবার আগে খাতায় বার বার লেখে—

কি লেখে, কি লিখেছে। সীতেশ সূত্রটা বুঝতে চায়। ছোড়দি স্থির হয়ে বসে আছে।

কিরণ বলল, আমি পড়ছি।

সে খাতাটা ব্যাগ থেকে বের করে পাতা উল্টে গেল। সীতেশ খাতার উপর ঝুঁকে দেখছে।

ছোড়দি বলল, আজ ও-সব থাক। বরং ওর কবিতা আজ আমরা পড়ি।

কিরণ বলল, নিশ্চয় পড়ব। আজ না। তার শোক সভায়। আমরা কেউ পড়ব না, তার কবিতা তুমিই পড়তে পার। তার সব কিছুর অধিকার তোমার। শোনো।

ছোড়দি বলল, না অন্য কোনো কবির কবিতা আজ আমায় শুনতে ভাল লাগবে না। দেখে আসি, ও কি করছে।

ও ভালই আছে। ছোড়দি পাগলামি করবে না। একদম উঠবে না। কেন সে কবিতার এই সব পংক্তি, কখনও কিছু লাইন পর পর লিখে, দেখেছে নিজেকে। নিজেকে না দেখে সে বালির চরায় হারিয়ে যেতে একদম রাজি ছিল না।

শোনো।

উসখুস করছিল ছোড়দি।

শোনো।

ছোড়দির যেন শীত করছে।

শোনো।

ছোড়দির চোখে পলক পড়ছে না।

কিরণ পাতা উল্টে গেল।

তবুও তোমারে আমি কোনো দিন পাব নাকো' অসীম আকাশে। এই লাইনটা লিখে একটি মেয়ের সুন্দর ছবি এঁকেছে নিচে, সীতেশ ছবিটা দেখার আগ্রহ বোধ করল না। ছোড়দির অনাগ্রহ যেন আরও বেশি।

কিরণ ফের পাতা উল্টে গেল।

পৃথিবীর পথে যদি ফিরি আমি—ট্রাম বাস ধুলো/দেখিব অনেক আমি—দেখিব অনেকগুলো/বস্তি, হাট,—এঁদো গলি, ভাঙা কলকী হাড়ি/মারামারি, গালাগালি, ট্যারা চোখ, পচা চিংড়ী—কত কি দেখিব নাহি লেখা/তবু তোমার সাথে অনন্তকালেও আর দেখা হবে নাকো' দেখা।

ছোড়দির মুখ মোমের আলোর শিখায় কাঁপছে।

কিরণ ছোড়দির দিকে তাকিয়ে কিছু একটা আন্দাজ করার চেষ্টা করল। ছোড়দি চোখ বুজে আছে।

সীতেশ বলল, তোমার কি শরীর খারাপ লাগছে।

ছোড়দি চোখ বুজেই বলল, না। ভালই আছি। কিরণ দা থামলে কেন ? পড়ো।

শেষে এই লাইনটা বার বার লিখেছে হতচ্ছাড়া। কী যে করতে ইচ্ছে হচ্ছে না। এত কি দুঃখ ছিল তোর। তুচ্ছ কারণে মরে গেলি। তুই কিরে!

তুচ্ছ বলছ কেন কিরণ দা। সে থাকতে চেয়েছিল। তাকে আমি তাড়িয়ে দিয়েছি। তাকে আমি কথা দিয়েছিলাম।

কি কথা।

কি কথা, আমি নিজেও জানি না।

সীতেশ বলল, ওর কথা বাদ দাও। ওর কি মাথার ঠিক আছে। স্বাভাবিক থাকলে বলতে পারত, তার ঘরে সে আসবেই। তাকে আমি কথা দিয়েছিলাম। বল, কোনো নারী পারে! তোমাদের ছোড়দি এখন সব পারে। আমার দিকটা বুঝবে না!

কিরণ তার মায়ের মুখের সঙ্গে যেন মিল খুঁজে পাচ্ছে এই নারীর। বাড়িটা এখন বশিষ্ঠদার উৎপাতে নরক হয়ে আছে। তার আর পড়ার স্পৃহা থাকল না। খাতাটা ছুঁড়ে দিয়ে উঠে পড়তে ইচ্ছে হল। কিন্তু পারল না। ছোড়দি তার হাত চেপে ধরেছে।

পড়ো কিরণদা। মানুষ মরে গেলে তার সঙ্গে আর যাই কিছু করা যাক, শত্রুতা করা যায় না। বুঝতে পারি তাকে তাড়িয়ে দিয়ে কত বড় অপমান করেছি। আমি কত অসহায় সে যদি বুঝত! তুমি পড়ো কিরণদা:

কিরণ পড়ল।

হেঁটেছি অনেক পথ।

হেঁটেছি অনেক পথ—আমার ফুরালো পথ।

হেঁটেছি অনেক পথ—আমার ফুরালো পথ—এখানে সকল পথ তোমার পায়ের পথে গিয়েছে নীলাভ ঘাসে ছেয়ে।

আর কিছু না! ছোড়দির ঠোঁট কেঁপে গেল বলতে গিয়ে।

ছোড়দি উঠে নিজের ঘরের দিকে অদৃশ্য হয়ে গেল। তাকে আর দেখা গেল না। কিরণ বলল, আমি উঠি। ভাল লাগছে না। লক্ষ্য রাখিস। ছোড়দিও কিছু না করে বসে!